কামিখ্যের ঠাকুর

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন—বজ্‌বজ্‌
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ফাল্গুন—১৩৪৪
মূল্য এক টাকা

কলিকাতা, ২১নং হলওয়েল লেন, সাহিত্য-ভবন প্রেসে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা
৺ জ্যেঠাইমাতাঠাকুরাণীর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থখানি সাদরে
উৎসর্গীকৃত
হইল

কামিখ্যের ঠাকুর

বোঝা-পড়া

ভূতির মার মহাষ্টমী

ছেঁড়া জুতো

বন্ধন

মাতৃঋণ

নিবেদন

গল্পগুলি প্রবাসী, বসুমতী, বিচিত্রা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

খেশরা
খুলনা
ফাল্গুন—১৩৪৪

গ্রন্থকার

কামিখ্যের ঠাকুর

নারীহরণের মামলায় কেবলরাম ছ'ছ'বার কাঠগড়ায় উঠে সত্যপাঠ করেছে, আবার পরক্ষণেই অসত্য ব'লে সত্যকে রম্ভাও দেখিয়েছে। তৃতীয়বারে কিন্তু সে বেতের শীষের ঘন কাঁটায় জড়িয়ে গেল। দীর্ঘ চারিটা বছর আলিপুরের ঘানিগাছে চক্র ফিরে শেষের দিনে জেলদারোগার বাসায় দু'টি খেয়ে দেয়ে যখন বিদায় নিলে, তখন রাত্রি বেশ জমে উঠেছে।

রাজপথ জনশূন্য। দু'ধারের গ্যাসের আলো তরল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। পোষ্টের ছায়ার আড়ালে পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। লাল চোখ দুটি ঘুমের তরে ক্ষুধার্ত্ত। হেঁট মাথায় ঝিমুচ্ছে।

রাস্তাটা মাজাঘষা পিচ-ঢালা। ছাড়া পেয়ে কেবলরাম এক নূতন জগতে ফিরে এল। ঘাড় আর সোজা নেই, কৌতূহলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে চলেছে। এক টুক্‌রা ভাঙা পাথরে সে হোঁচট খেলে। ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌লে—পায়ের আঙুল একটা ছিঁড়েছে। যাক্—হাড়-গোড়গুলো ঠিকই আছে। সে চল্‌তে লাগল।

একে মনসা তায় ধূনোর গন্ধ। তার এই খুঁড়িয়ে চলা আর উস্কখুস্ক চেহারা দেখে গ্যাসপোষ্টের আড়াল থেকে এক গালপাট্টাওয়ালা আলোকের দিকে হেলে মাথার লাল পাগড়ীটা সুদর্শন চক্রের মত বিস্তৃত করে ধরলে। গুরুগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ হ্যায়!"

"সাধু হ্যায়।"

"দিনকা সাধু—না, রাতকা?"

কেবলরাম এই পাগড়ীর বিভীষিকার মাঝখানে বাস করছিল।

কাজেই মনে কিছু সাহস জন্মা ছিল। কাছে এসে বললে, "কেন মহারাজ, পাক্কা চাবটা বছর তোমাদেরই সঙ্গে ত সাধুসঙ্গ কিয়া। দেখিয়ে মহারাজ, চুল, দাড়ি, নওখর দেখিয়ে—" সে ঝাঁকড়া-মাকড়া চুলগুলোয় একবার ঝাড়া দিলে।

পাহারাওয়ালা তখন চুণ-দোক্তা বের করে হাতের তালুতে টিপ্‌তে সুরু করেছিল। সেটায় দু'তিনটা থাবা মেরে ঝেড়ে ঠোঁটের ফাঁকে ফেলে জমিয়ে রাখলে। জিজ্ঞাসা করলে, "কাঁহা সাধুসঙ্গ কিয়া ?"

"আজ্ঞে, শ্বশুরবাড়ী বল্‌লে পেত্যয় অধিক হ'ত—দেহের যে কান্তি খুলেছে। কিন্তু ঘোড়ামার্কা মদ আমি খাইনে। যদি দিব্যি করতে বল, চলিয়ে ওই কালীবাড়ীমে।"

পাহারাওয়ালা চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে, "কাঁহা থে, ঠিক কহিয়ে।"

কেবলরাম হাতজোড় করে বল্‌লে, "আজ্ঞে, ওই যে লাল রঙের পাঁচিলটা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, ঐটেয়। কি আদর-যত্নের ঘটা! লাউ-কুমড়োর ডাঁটা কভি খায়া হ্যায় ?"

"কেন, কোবি, বিট, গাজর এসব নেহি খায়া ?"

"ও সব খেলে যে পাঁজর বাড়ে! ময়রায় বুঝি সন্দেশ খায় ? হামরা হাতকা তৈরী হ্যায়, মহারাজ।"

পাহারাওয়ালা দাড়িটায় অঙ্গুলি চালনা ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমারা ছুটি মিলা ?"

"আজ্ঞে, হাঁ। মামাটি ডেকে বল্‌লে,—যা, তোর শিংয়ের দড়ি খোলা পড়ল। জলে, স্থলে, মরুৎ ব্যোমে যথেচ্ছ চরে বেড়াগে। শুধু পরকা পাঁচিল মাৎ ডাকো।"

পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে, "নেংড়াতে কেঁও হো ?"

"আজ্ঞে অনেককাল পরে গ্যাসের আলোটা চোখে লেগে সইছে না।

পাথরে লেগে আঙুলটা ছিঁড়ে গেল, এই দেখ। খোঁড়াই কি সাধে, মহারাজ ?"

পাহারাওয়ালা তার হাত চেপে ধরলে। বললে, "তুম্ বড়ে বেকুব, আউর বদ্‌মাস্ হো।"

কেবল বল্‌লে, 'এটা কিন্তু তোমাদের ছাইগোষ্ঠীর অনুরূপ কথাই হ'ল। এমনি ত যেতে দাও না! অত বড় পাঁচিলটার ভিতরে কি বস্তু আছে না দেখ্‌লে যে প্রাণ ছুক্‌ছাক কর্‌তা হ্যায়।"

পাহারাওয়ালা তার হাতের পাঞ্জাটায় একটু চাপ দিলে। কেবলরাম ব্যথায় 'উঃ! হু' করে উঠ্‌ল। বললে, "কসুর মাপ কর জী! পিঠ্‌টায় বেত চালিয়ে মিহিদানা বেঁধে দিয়েছ, হাতটায় আর কেন, বাবা! হাত যানেসে কসরৎ ক্যায়সে দেখায়গা ?"

পাহারাওয়ালা হাসলে।

কেবলরাম বললে, "মাপ কর মহারাজ! খাঁচার দরজাটা যদি বা খোলা পেলাম, রাস্তাঘাটে শিং উঁচিয়ে আছ, পথ চলি কি করে? রেহাই দাও, ভাই! তোমাদের কৃপার কথা ভুলব না। ঘর যা'কে ভাই বন্ধ খেলায়কে সুদ আসল আদা কর্ দেগা।"

পাহারাওয়ালা চুপ করে রইল।

কেবলরাম বললে, "আবি হাম যাঁয়ে ?"

"আচ্ছা! মন ঠিক রাখ্‌না!"

কেবলের তখন পায়ের আঙুল দিয়ে রক্ত ঝর্‌ছে, আর ব্যথায় টন্ টন্ করছে। কিছু দূর এগিয়ে উঠ্‌তে সে দেখ্‌লে, একটা বটগাছের তলায় ধূনী জ্বলছে। ছেঁড়া আঙুলটায় একটু ছাই ঠেসে দেবার মতলবে সে সেখানে গিয়ে দেখলে, এক লম্বোদর সন্ন্যাসী—বোধ করি নাগা—হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত হাত পা খিঁচিয়ে মাটির উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কেবলের একমাথা রুক্ষ চুল আর গা দিয়ে খড়ি উড়ছে দেখে ঘনিষ্ঠতায় সন্ন্যাসীর স্নেহরস বেগবতী হয়ে উঠ্‌ল। তিনি ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে বসালেন। স্মিতহাস্যে বললেন, "জয় সীতারাম! রামকে ছাড়তে চাই—রাম ছাড়ে না। মহাপ্রভুর প্রেম দেখ। তোমার মত একটি কল্যাণবস্তুকে কাছে পেতে সীতারামকে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম।"

কেবলরাম আড়চোখে তাকিয়ে বললে, "কেন, বঁড়শী গেলাতে?"

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, "সে রকমের চার নেই ঝুলিতে, বাবুজী!"

কেবলরাম আঙ্‌ুলটায় ছাই ঠেসে দিচ্ছে, এমন সময় সন্ন্যাসী তার দিকে চেয়ে আবার মৃদুহাস্য করলেন। বললেন, "ভুঁড়িটা—মৃদঙ্গ। দুপুরের আহারটাও পরিপাক হয়নি। এক টিপ সাজো। দুধ আছে, কলা আছে, খাও। পরে তেলেজলে পেটটা একবার মর্দ্দন করে দাও।"

কেবলরাম ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললে, "সর্ষে মর্দ্দন করেই ত সবে বের হচ্ছি। পথে পা না দিতেই ভুঁড়ি মর্দ্দন? মর্দ্দনযোগই কায়েম হ'ল তা' হলে?"

"সর্ষে কোথায় মাড়ালে?"

"আজ্ঞে, এই ভবসিন্ধুর কাছাকাছি।"

"কেমন?"

"আজ্ঞে, ভবঘুরে লোক আপনারা, ঘানিগাছটাও দেখেন নি? নাগরদোলায় চড়েছেন ত? ঐ রকমের ঘুরপাক আর কি! কলির রাজ্য—মানুষ হ'ল বলদ। চোখ দিয়ে ফুল কেটেছে, আর ভেবেছি ভবসিন্ধু বুঝি কাছে।"

সন্ন্যাসী হাস্য করলেন। বললেন, "দেহে দেখি মেদমাংস নেই। নির্ব্যূঢ় স্বপ্নেই এই মর্দ্দনের কাজ করেছ?" এখানে কিন্তু দুধ আছে—কলা আছে।

"হাঁ, ও দ্রব্যটায় লোভও আছে। অনেককাল খাইনি। কথাটা এই,—এখানেও যে সেই সর্ষে ?"

"সর্ষে নয়—সর্ষের ক্বাথ। আম আর আচার এক জিনিষ নয়। তেলেজলে মালিস্ কর্‌লে পেটটা ঠাণ্ডা হবে।"

তিনি পুনর্ব্বার হাস্য কর্‌লেন।

সন্ন্যাসীর নাম যমুনাগিরি। সত্য সত্যই একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। কেবলের ভাগ্যসূত্র তখন অপর রাস্তা ধরে চলছিল। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কলকের আগুনটা ?"

"ছাই পড়ে যাচ্ছে ? দাও, শুয়ে পড়েই টানি ?"

কেবলরাম ক্ষুধার্ত্ত ছিল। কলিকাটা সাধুর হাতে দিয়ে, ঘন আঠা দুধের মধ্যে গোটা-আষ্টেক কলা চট্‌কিয়ে হাপুস্ হুপুস্ করে খেয়ে বাটিটা সে চাটতে লাগ্‌ল। সন্ন্যাসীর তখনও দম চলছে। শিয়রের কাছে চার পয়সা দামের একখানা টিনের আয়না মাটিতে পড়েছিল। সেখানা হাতে তুলে নিয়ে চেহারাটা বহুকাল পরে একবার সে দেখে নিলে। সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসলে। মনে মনে বললে, "রতনে রতন চেনে।"

সন্ন্যাসী কেবলের হাতে কলিকাটি দিলেন। সে ভরাপেটে আমেজ করে বসে বসে টান্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌তে লাগল,—জট পাকিয়ে ঘট হয়ে বসে নিষ্কলুষ বামাচার সাধনা—বিবেচক বটে। দুধ, ঘি, আটা, চিনি, কলা, করুণা—উপরি পাওনার অভাব নেই। তারপর বামহাতে নিজের চুলগুলো টেনে টেনে দেখে ভাবলে,—চুলটা লম্বাই আছে, ঘেঁাট বেঁধে নাকের ডগায় নজর রাখ্‌তে পারলেই পাকা কচ্ছপ। খোলার ভিতর শুঁড় গুঁজে জোচ্চুরি চোখে মক্কেল খেঁাজা—মন্দ কি ?

সে আর নড়্‌ল না। যমুনাগিরির কাছে চেলাগিরি কর্‌তে রয়ে গেল।

২

কেবলরামের বুদ্ধির ঘটে চেতনা ত নেই—আছে ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াটাকেই আঁকড়ে ধরে সে ঘনীভূত করতে চায়। যমুনাগিরির সঙ্গে থেকে দুধ, ঘি, আটা, কলা আর মিষ্টান্নের সহযোগে দেহখানা সে বেশ জুতসই করে তুললে এবং সাধু সাজ্‌বার খুঁটিনাটি মারপ্যাচ—মায় তাবিজ মাদুলী, সিঁদূর পড়া—সমস্তই সে আয়ত্ত করে নিলে। তখন আর এ ভুঁড়িমর্দ্দনের কাজ একান্ত আপত্তিকর, অপমানজনকও বটে! একদিন মধ্যরাত্রে নাসিকাধ্বনির অবসরে সাধুকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে কামিখ্যায় চলে এল।

কেবলের গায়ে কুসুম রংয়ের খদ্দরের আলখাল্লা। পরণে গৈরিক বস্ত্র। অঙ্গে বিভূতি। ওষ্ঠে মৃদু হাসি। বাহিরে বিনয়—অন্তরে প্রণয়। চোখে আধঘুম,—জুতার শব্দে বোজে—চুড়ির ঠুং ঠাংএ খোলে। গাছতলায় দিবারাত্র ধুনী জ্বলে। সে ভাং খায়—তুলসীদাস পড়ে—সিদ্ধ হতে বাকী কি?

তা' হলেও ক্ষিধে তেষ্টায় প্রথম প্রথম দিনকতক চোখে তার তারা ফেটেছে। এক এক সময় মনে এসেছে,—ধূনীর আগুন সে নিবিয়ে দেয়—আলখাল্লার বোতাম ছিঁড়ে ফেলে। এই সময় ব্রহ্মপুত্রের স্নান উপলক্ষে আস্তে আস্তে অনেকগুলি লোটা চিম্‌টাধারী এসে তাকে ঘিরে বস্‌ল। বেশ মিশ খেলে—কেবলের রীতি প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক। অতগুলো বয়োবৃদ্ধ জটাজুটোর মাঝখানে তরুণ সন্ন্যাসীটির আসন দেখে, দেশের লোকের চোখে তাক্ লেগে গেল। মাথা গেল গুলিয়ে। ছেলের অসুখে ডাক্তার কবিরাজ কেহ ডাকে না—বাবার বিভূতি নিতে ছুটে আসে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন কেহ করে না—বাবার পদরেণু পাবার জন্য সাষ্টাঙ্গ হয়ে ভূমি চুম্বন করে। পসার বেশ জমে উঠ্‌ল। ক্রমে জনৈক

ধনাঢ্য লোকের কৃপায় একটা পাকা বাড়ীতে সে আশ্রম ফেঁদে বসল। সকলে এখন তাকে 'ঠাকুর বাবা' বলে সম্বোধন করে।

সকাল সন্ধ্যা দু'বার বাবার দেহ লয়ে চেলা-চামুণ্ডারা ময়দা ঠাসে। বেলা আটটা অবধি শৌচাচার, আসনযোগ, কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চেতনা সঞ্চার। পরে বৈরাগ্যযোগ,—কামিনীকাঞ্চনে স্পৃহাহীনতা, ঠাকুরের কৃপার জন্য বিপন্নগণের আনীত তুচ্ছ ঘৃত দুগ্ধ ও ফলমূলের প্রতি আড়নেত্র। তারপর উদর এবং বিশ্রামযোগের পর বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গীতা, তুলসীদাস ও চণ্ডীপাঠ, খোল করতাল সহ নাম সঙ্কীর্ত্তন। বাবা এ সময় ভাববিভোর হয়ে পড়েন। সময় সময় চৈতন্য থাকে না। পরে আবার আসনযোগ,—দেশের আপদ বিপদ আধিব্যাধির কল্যাণ ভিক্ষা। অন্তিমে শান্তিপর্ব্ব। এই সময় ঠাকুরবাবা নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করেন। এদিকে উৎকণ্ঠায় বাহিরে সোরগোল পড়ে যায়, না জানি কাকে কাছে ডেকে ঠাকুরবাবা অনুগ্রহ বিতরণ করবেন। চেলারা টহল ফেরে, তল্পিতল্পার আঘ্রাণ নিয়ে দেখে কাকে বাবার কাছে এগিয়ে তোলা যায়। নেড়া মাথা অনেকেরই—ধন্না দেওয়া সার হয় অনেকের। পনর দিনে হয়ত একটি লোক নির্জ্জন কক্ষে বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকারী হয়। অপর সকলে নিজ নিজ অদৃষ্টের উপরেই দোষারোপ করে। বাবার প্রতি অনুযোগ থাকে না। এইরূপে কেবলরাম যে একজন সিদ্ধপুরুষ এ বিষয়ে কারও মতভেদ ছিল না।

এখানকার ফেরৎ ঝণ্টুর মা একদিন বিরাজ ঘোষের স্ত্রী কেতকীকে এসে বললে, "মা, এই অসুখে ভুগ্‌ছ, একবার কামিখ্যের ঠাকুরের কাছে যাও। বললে পেত্যয় যাবে না,—আমার ঝণ্টুর কি আর বাঁচার পিত্যেশ ছিল? যা খায়, পেটে পড়লেই গড়্ গড়্—গড়্ গড়্—ঢেঁকুর আর ঢেঁকুর। একবিন্দু ভস্মিতে ত জল হযে গেল।"

কেতকীরও এই ঢেঁকুরের রোগ। যা খায়, অম্ল হয়; হজম হয় না।

ঝণ্টুর মা বললে, "সবাই কি আর তাঁর কৃপা পায়, মা? কত লোকে হা-পিত্যেশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। পয়সা কড়ির ত অভাব নেই, একবার ঘুরে এস।"

এইরূপে কেতকীর প্রাণে বেশ একটু ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

বিরাজ বাজার করে ঘরে ফিরলে। বললে, "কুম্‌ড়োর ফরমাস ছিল, বলে কিনা—আটগণ্ডা পয়সা। পুঁজি ত সবে একটি টাকা। অর্দ্ধেক যদি তোর গেঁজেয় গেল, বাড়ীর লোকের আর নিরনব্বইটা আইটেম ঠেকাই কি দিয়ে? এনেছি গলা সরু, পেটটায় একটা ফ্যাঁকড়া—যেন ম্যালেরিয়ার পিলে। তা' তরকারীতে বলন দেবে। তিন পয়সা সেলামী। ছোঁড়া হাবাগোবা তাই রক্ষে।"

স্বামীর হাতের মাছের থারাটায় নজর পড়্‌তে কেতকী রেগে উঠ্‌ল। বললে, "আজ আবার চিংড়িমাছ এনেছ? ও ঘুষোচিংড়ি খেতে লোকের মুখে কতকাল রোচে? ছেলেরা খেতে চায় না।"

বিরাজ হাতের বোঝাটা মাটির উপর ধপাস্‌ করে ফেলে রেখে রুক্ষস্বরে জবাব দিলে, "না চায়, এনে নিয়ে খেলে পারে? দর করলাম ত রুইমাছ। বলে,—পাঁচসিকে সের। বললাম,—পয়সাটা আমরাও কপাল ঘামিয়ে আনি। এই দশগণ্ডা পয়সা নে, বরফ দিয়ে মাছের জেতের কি আর ইজ্জত্‌ রেখেছিস্‌? বেটী দাঁত খিঁচিয়ে এল, যেন ক্ষ্যাপা কুকুর। যেই পিছন ফিরেছি অমনি বললে,—মিন্‌সে বাবার কালে কখনও মাছ চোখে দেখেছে? ও আবার মাছ কিনে খায়।"

একটু দম নিয়ে বিরাজ বললে, "নগদা টাকার মাছ কিনে সুখ দেখ। ঘরে এনে কড়ায় ছাড়লে ঘণ্ট, তেলের কড়ি গেল উড়ে, পেটে পড়্‌লে বদ্দির কড়ি গেল বেড়ে. তার ওপর ছোট জেতের মুখের এই চৌদ্দপুরুষ। বাবার কালটা আমিই দেখিনি, আর ও-মাগী কি না মেছোহাটায় বসে দেখে ফেললে। বাজারে কি মানুষ আসে তুমি ভাবো? সব হাঙ্গর—কুমীর—কর্কট।"

কেতকী জবুস্থবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাব্‌লে, মাছে দরকার নেই, এখন থাম্‌লে বাঁচি।

বিরাজ আবার সুরু করলে। বললে, "চিংড়ীমাছটাও মুফোতের জিনিষ নয়। পয়সায় গণ্ডা দিক্ আর এণ্ডাই দিক, কিন্‌তে সুবিধে আছে। মার্কামারা দু'পয়সার ভাগা। চারটে ভাগা তুলে নিয়ে—আটটি পয়সা তক্তাখানার উপর বাজিয়ে রেখে চলে এলাম—ঝঞ্ঝাট নেই। নিজেও বাঁচলাম, বাপ-ঠাকুরদাও বেঁচে গেল।"

কেতকী নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিরাজ বললে, "তুমি যে একেবারে কাঠ হয়ে গেলে? বেটা পাঞ্জাবী মোটর ভোঁ ভোঁ করে রাস্তার সমস্ত জল কাদা ছড়িয়ে দিলে জামাটায়, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নেই। এক্ষুণি আবার গিয়ে চার পয়সার একখানা সাবান—এই সব দমকা খরচ! তা তোমারও যে সুবিধে। এর আর ল্যাজামুড়ো বাছাবাছি নেই। ছেলেদের চেঁচামেচি নেই। রাঁধ্‌তেও সুবিধে। লঙ্কা কেটে সাঁত্‌লে দাও—তোফা!"

বিরাজের একটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, বেগুন কি মোটে দুটো এনেছ? বেশ বড় বড় ত, একসের?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও সেদিন একসের এনেছিলাম। সে কিন্তু ছ'টা।"

বিরাজ মুখ ভেঙচিয়ে বললে, "আরে গাধা! সেই সঙ্গে বোঁটাও ত আনলি ছ'টা! তার বুঝি ওজন নেই?"

কেতকী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সেইখানে মাছগুলি ঢেলে দু'হাতে খোসা ছাড়াতে বসে গেল।

কেতকী এই যে রোগে ভুগ্‌ছিল তবুও দেহের অসামান্য রূপ তার ঢাকা পড়েনি। উদাসীন শান্তশিষ্ট সদাশিবের মত নির্লিপ্ত সে রূপ। আকর্ষণও আনে—শ্রদ্ধাও জন্মায়। বিরাজ এক কলকে তামাক সেজে দেহের ক্লান্তি দূর করার জন্যে স্যাঁতস্যেঁতে মেঝেটার উপর প্রায় কেতকীর ভুলুণ্ঠিত অঞ্চলটার গা ঘেঁষে উপবেশন করলে।

কেতকী যেন বিনা আয়াসে অনেকখানি আদর কেড়ে নিতে পারলে। বাজারের খুঁটিনাটি ভুলে গিয়ে মিষ্টস্বরে সে বললে, "অম্বলের ব্যারামটা কি আমার পুষে রাখবে?"

বিরাজ হুঁকাটা একবার জোরে টেনে নিয়ে বললে, "পোষ মানাচ্ছত তুমি। একটু নড়াচড়া কর দিকিনি, দেখি, অম্বল কেমন কম্বল পেতে বসে যায়?"

কেতকী হাসিমুখে কটাক্ষ হেনে বললে, "নড়াচড়া করিনি বুঝি? ঠাকুর চাকরের ছড়াছড়ি করে রেখেছ কি না?"

বিরাজ বললে, "ওই ত একটা পরের মেয়ে এনে ঘোরাচ্ছ। সেও বা দুটো ভাতের জন্যে দাসী বাঁদীর মত খেটেখুটে অকারণ এ ভালবাসার টান কেন দেখাতে যায়?"

কেতকী কিছুদিন থেকে তার এক বিধবা নিরাশ্রয়া ভগ্নীকে এনে কাছে রেখেছিল। এবার মুখখানা ঘোলাটে করে সে জবাব দিলে, "বলতে গেলে তোমার কথার মধ্যে ত খেই পাওয়া যায় না। আমার কাজের আসান করতে আমি ওকে আনিনি। ওর কি দাঁড়াবার ঠাঁই আছে কোথাও? পয়সাটাই কেবল চিনেছ তুমি!"

বিরাজ একমুখ ধূম হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। নিষ্ফলতায় কতকটা দমে গিয়ে লঘুস্বরে সে বললে, "নেহাৎ গালির মত করে কথাটা বললে। পয়সা চেনা ভাল কেতকী! যে তিনটি রত্ন তুমি ভূমিষ্ঠ করেছ, ওরা তোমার ভাত কাপড় জোগাবে কি?"

কেতকী বিষণ্ণমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "ওরা আবার কি দোষ করলে?"

বিরাজ কানের পাশের চুলগুলো চুলকিয়ে নিয়ে বললে, "তুমি ওদের মা, শুনতে তোমার টকই লাগবে। আমিও জন্মদাতা, অকারণ ওদের নিন্দুক হতে পারিনে। মুস্কিল যে, বিরাজের চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রটি ইউক্লিডের পাতা খুলে সমবাহু বিষমবাহু আবৃত্তি করে যান্—নীচে নকুল চৌধুরীর বটতলার 'প্রণয়ের হাট' উঁকি মারে। কচি ছেলে—এখন কি হাট-ঘাট বসানর বয়েস ওর? মধ্যমটি সকাল-সন্ধ্যে ছাদের উপর মুগুর নিয়ে ক্ষেপে ওঠে। ভূমিকম্পটা তোমার গায়ে লাগে না বুঝি? আমি ত ভাবি বাড়ীটায় বুঝি অসুর আশ্রয় করেছে। বাপ-ঠাকুর্দ্দার একটুখানি স্মৃতি ও-ই ইষ্টকস্তূপ করে ছাড়বে।"

সন্তানের প্রতি এই মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে কেতকীর অন্তর ক্রন্দনোন্মুখ হয়ে উঠল, বিরক্তির সঙ্গে সে বললে, "মুগুর ভেঁজে বাড়ীটা ফেলে দেবে ও?"

"না দিক, পথেঘাটে ঘুষি বাগাতে ত বাধা নেই? শেষটা পুলিশ কেস—ঢালো টাকা—খোঁজ মহাজন—এই ত?"

কেতকীর আড়ষ্ট ওষ্ঠ দু'খানা কাঁপছিল। অগ্নিময় চক্ষুদুটি সম্ভবমত স্নিগ্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করলে, "তিনটি রত্নের দুটির খবর ত দিলে। আর একটি?"

বিরাজ বললে, "তোমার ঐ কোলের ছেলেটি? যে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে—হাড় ত একখানা ভাঙলো। ডাক্তারের ফি ত ক্রি

নেই। আর গিয়ে এখনকার এই আধুনিক চিকিৎসে—লাঠির জায়গায় সড়কী। বেটারা যাকে বাগে পায়—ভাবে টাকার আণ্ডিল। শেষটা আমারই বুকে ভল্ল। এই বয়সে মায়ের কোলে চড়ার তেষ্টা কমে গেল, মিষ্টিমুখে কোলের মধ্যে চেপেচুপে ঠেসে ধরে রাখতে পার না?"

কেতকী ঠোক্কর মেরে বললে, "যে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে ওকে—ওষুধের বালাই নেই, লাফালাফি না করলেও বা রোগ তাড়ায় কি করে?"

বিরাজ বললে, "যাই হোক্ মাত্রাজ্ঞান ত থাকা চাই। পোষ্টাপিসের কুইনাইন দু'বড়ী এনে খাওয়ালে পার! ওষুধের রাজা! হাণ্ডবিল দেখেছ?"

কেতকী দেখলে এ আসরে কামিখ্যের পালা আর জমে না। ঝণ্টুর মা নেশাও ত বড় কম ধরিয়ে দিয়ে যায় নি। সেই ঝোঁকে সে প্রশ্ন করলে,—"আমার অম্বলের কথাটা—"

বিরাজ হেসে বললে, "ছাদে উঠে দিনকতক ডাম্বেল ভাঁজ না!"

কেতকী ভাবলে পরিহাস। পুনশ্চ বললে, "কামিখ্যেয শুনেছি একজন ভাল সাধু আছে। ঝণ্টুর এই অম্বলের ব্যারাম, তাঁর ওষুধে ত সেরে গেল।"

"কামিখ্যে—ক্ষেপেছ তুমি?"

চোখদুটো কপালে তুলে দুই কর্ণে সে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিলে।

কেতকী বললে, "চম্‌কে গেলে যে!"

"শুধু আমি চমকাইনি—পেটের পিলে পর্য্যন্ত। আক্কেল গুড়ুমের দেশ, বাবা! শেষে লোকে বলুক,—বিরাজ একটা আহাম্মক—আর মুখ টিপে হাসুক!'

কেতকী হেসে বললে, "কেন, কাছাকোঁচা নেই নাকি তোমার।"

"সেটা ত আছেই। না থাকলে তোমার বাবাই বা জামাই বলে

স্বীকার করবেন কেন? এক একটা দম্‌কা হাওয়া এক এক সময় এমন আসে, কাছা ত কাছা—কোঁচা ত কোঁচা—মানুষ পর্য্যন্ত উড়ে যায়। বুড়ো বয়সে আর ডিগবাজী না খেলালে?”

কেতকী তখনকার মত চুপ করে গেল।

৩

বিরাজ বাঁকলে কি হয়—কেতকী আর অধিক রাগলেও না, গোঁ ধরলেও না, চুপচাপ শয্যা নিলে। বিরাজ দেখলে, মা মঙ্গলচণ্ডী পাঁচ পয়সার সিন্নিতে আর তুষ্ট হলেন না, দমকা খরচ একটা লাগবেই। কামিখ্যাটা একবার ঘুরিয়ে না আনলে, এঁকে শয্যার উপর আর চাঙ্গা করে তোলা যাবে না। তখন কেতকীর বোনের কাছে ছেলে তিনটির ভার দিয়ে সে সস্ত্রীক সেই আক্কেল-গুড়ুমের দেশে চলে এল। এসে দেখলে, ঝণ্টুর মা বড় মিথ্যা বলেনি। সাধুর আশ্রমটি লোকে লোকারণ্য। ভুমে লুটিয়ে কাতারে কাতারে লোক পড়ে রয়েছে! কেহ সাত দিন—কেহ পনর দিন—কেহ বা মাসের উপর। সাধুর কৃপা মিলছে না। বিরাজের অন্তরে কিছু শ্রদ্ধার সঞ্চার হ'ল।

সে সস্ত্রীক নাটমণ্ডপে শুয়ে আছে। রাত্রি গভীর, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলে, ঠাকুরবাবার একটি চেলা এসে তারই অদূরে শায়িত মথুরবাবুকে বলছে, “বাড়ীর পুজোপার্ব্বণে তোমার দৃষ্টি নেই। ছেলের অন্নপ্রাশনে বেশ ঘোরঘটা আছে! তোমার চিনির নৈবিদ্দি জগন্মাতা গিলতে পারে না। বাবা তাঁরই উপাসক। মায়ের কৃপা না হ'লে, বাবা কি করতে পারেন?”

মথুরবাবু বললেন, “দেবতা ত অল্পেতে তুষ্ট সাধুজী?”

“তা তুষ্ট। ঝোঁকটা ত অল্প হ'লে হয় না। দেবতার পিছু ব্যয়

তুমি অপব্যয় বলে মনে কর। আধি-ব্যাধির আর দোষ কি? তোমার ভোগকাল এখনও গত হয়নি মা। দায়ে পড়ে মায়ের উপর যেমন লোভ বাড়াও, বেদায়ে সেইরকম শ্রদ্ধা করতে শেখো,—তারপর এস। বাবা এই কথা বলে দিলেন।”

মথুরবাবু নিঃশ্বাস ছাড়লেন। স্ত্রীটি অশ্রু মার্জ্জনা করতে লাগলেন।

মনের ভিতর কোথায় কি ঘটে গেছে, নিজের কাছে ওজন করে পরিমাণ করাও শক্ত। তাতে আবার এই অবলার মন। মথুরবাবু বলতে লাগলেন, “অন্তর্দ্দশী সিদ্ধপুরুষ। ওঁর অগোচর কিছুই নেই। মনের খবরটি পর্য্যন্ত টেনে বের করেছেন। সত্যি ত ঠাকুর-দেবতার পূজো বাইরের ঘরে ঘণ্টা বাজিয়ে পুরোহিতে কি করছেন না করছেন—ফিরেও দেখিনে। অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে জনে জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করি,—তৃপ্ত হলেন কিনা? চেলাটি যা বলে গেলেম ওর আর ব্যত্যয় হবে না। চল, কৃপা পাবার মত যদি হতে পারি, তখন আসব।”

এই বলে আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রেখে তাঁরা স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

বিরাজ স্ত্রীকে ডেকে বললে, “শুনলে? না জানি তোমার ঘাড়ে আবার কি অস্ত্র রয়েছে। গোস্ত খরচ—খাই খোরাকী—রাত জাগুনি—আঃ! একেবারে জ্যান্তে মেরেছ? যে রকম গতিক, কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে, তোমার পেটের অম্বল সম্বল করে ঘরে ফিরতে হবে।”

কেতকী এ-কথার আর জবাব দিলে না। ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

তিনদিন পরে বিরাজের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'ল। ঠাকুর-বাবার প্রধান শিষ্যটি এসে প্রশ্ন করলে—সেই একই প্রশ্ন,—দেবতার ভোগ কত'র দাও ছেলের অন্নপ্রাশনে বা কি খরচ কর? অবশ্য প্রশ্নটি কিছু রকমফের করে করা হ'ল;

বিরাজ বললে, "দেবতার ভোগ সওয়া আনার বেশী কোনদিন দিতে পারিনি। আর অন্নপ্রাশন—ইষ্টদেবের একটু কৃপাদৃষ্টি আছে গরীবের উপর। তাই তাঁর প্রসাদ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর গালে ভাত দিয়েছি।"

বিরাজ ও তার স্ত্রীকে ভালমত পর্য্যবেক্ষণ করে চেলাটি চলে গেল।

বাবা বড়লোক সেই দেমাকে না হোক্, লোকের চোখে স্বামীর কোপন-স্বভাব কতকটা ঢাকা দেবার জন্য বাবার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি কেতকী কখনও গা থেকে খুলত না। এবার এ সমস্ত গায়ে চড়িয়ে আনতে বিরাজ অনেক আপত্তি জানিয়েছিল। কেতকী বলেছিল, 'তোমার এঁদো ঘরে দরজা এঁটে—গায়ে দিয়ে বসে থাকতে অথবা সিন্দুকে ঢাকা দিয়ে রাখতে ত বাবা এ সকল দেননি? যায়—যাবে; তখন আর পরবার বালাই থাকবে না।"

এদিকে কিছুক্ষণ পরে চেলাটি আবার ফিরে এল। বললে, "মাকে তলব করেছেন, ঠাকুরবাবা।"

বিরাজ জিজ্ঞাসা করলে, "অর্দ্ধাঙ্গ ছেড়ে? না, এ গরীবেরও যাবার অনুমতি আছে?"

চেলাটি বললে, "উনি একলাই যাবেন। সঙ্গে আর কারও থাকার নিয়ম নেই। গোলযোগ বাড়ে, বাবা মনস্থির করতে পারেন না।"

বিস্ময়ে বিরাজের চক্ষু দুইটি ঠিক্‌রে পড়ল। বললে, "রাত্রি যে অত্যন্ত গভীর সাধুজী। উনি গিয়ে আমার ঘরের পর্দ্দা—অম্বল সারাতে শেষটা আমাকে আবার হাঁপানিতে ধরবে?"

চেলাটি কুপিত হয়ে বল্‌লে, "বাবার উপর তা হ'লে বিশ্বাস নেই আপনাদের?"

বিরাজ আমতা আমতা করে বললে, "না—না, তা অবিশ্বাসই বা কি?

শুধু নাভিশ্বাসের ভয় করি। সেটা যেন তোমাদের এই নাটমণ্ডপে ঘটে না ওঠে।"

চেলাটি এবার রোষ প্রকাশ করে কিছু উগ্রকণ্ঠে বললে, "পেয়েও হাতছাড়া করলেন আপনারা? দুর্যোগ এখনও কাটেনি। আপনারা আর এখানে বৃথা ভিড় জমিয়ে অপর লোকের অসুবিধা ঘটাবেন না।"

কেতকী চেলাটির পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "আপনি ক্ষমা করুন সাধুজী!" স্বামীকে বললে, "তুমি কি পাগল হলে নাকি? এই সব দেবতা-লোকের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে?"

বিরাজ বললে, "পাকক্রিয়ার একটু দোষ ঘটেছে ওঁর, বাবা যদি তুক্‌তাক্ জানেন, এইখানেই একটু মেহেরবাণী করতে বল না। আমি ওঁর স্বামী—দেবতা। ঝক্কিঝাটি যে আমার অনেক।"

কেতকী বললে, "তোমার পায়ে ধরি আর তর্ক তুলো না। এই পয়সাকড়ি ব্যয় করে এসে সমস্তই যে ফাঁসিয়ে দিলে তুমি।"

বিরাজ দেখ্‌লে, কথাটাও সত্যি। বললে, "ঝণ্টুর মা তোমার গলায় ফাঁসি পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ও আর আমি ফাঁসিয়ে দিতে চাইনে। আচ্ছা! যাও। হাসতে হাসতে ফিরো যেন?"

কেতকী বাবার সকাশে নীত হ'ল। বিরাজ উৎকণ্ঠিতচিত্তে নাটমণ্ডপে বসে রইল

৪

কেবলরামের সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে কানাঘুষা চলছিল। সে নাকি নিশীথ রাত্রে মেয়েদের একাকী বাগানে নিয়ে যায়। নৌকায় নদীর উপর নিয়ে গিয়ে হাওয়া খায়। এই সব। জনরবটি বহুবিস্তৃত না হওয়ায় নূতন আগন্তুকদের কাছে গোপনই ছিল। কিন্তু কেবলরাম বুঝেছিল এখানে আর

অধিকক্ষণ বসে অশুভনাশের প্রলোভনে লোককে বাতিকগ্রস্ত করা নিরাপদ হবে না। সে জাল গুটাবার সমস্ত বিধিব্যবস্থাই ইতিপূর্ব্বে করে রেখেছিল। যাবার বেলায় মোটা রকমের একটা শিকার সে খুঁজছিল।

নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করে কেতকী দেখলে ঠাকুর-বাবা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। সেখানেও একটা ধূনী জ্বলছিল। ঘরটা গাঢ় ধূমে আচ্ছন্ন। কোথায় কি আছে ভাল দেখা যায় না। সে ত্রাসে সঙ্কোচে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বাবার ধ্যানভঙ্গ হ'লে কেতকীকে তিনি উপবেশন করতে ইঙ্গিত করলেন। ঘরটি তখন নির্জ্জন। চেলাটি চলে গেছে। বাবা বল্লেন, "তোমার সম্বন্ধে আমার উপর মায়ের প্রত্যাদেশ হয়েছে। আমার সঙ্গে প্রয়াগতীর্থে যেতে হবে। সেখানে বিল্বপত্র পাবে। যাত্রার জন্য সকলই প্রস্তুত। তোমার অভিপ্রায় কি, বল?"

কেতকী জিজ্ঞাসা করলে, "আমার স্বামীও ত সঙ্গে যাবেন?"

"তেমন আদেশ নেই। তোমাকে একলাই যেতে হবে।"

কেতকী ভাবিত হ'ল। বল্লে, "আমার স্বামী এখানে আছেন। তাঁর অনুমতি ভিন্ন ত যেতে পারিনে।"

বাবা মৃদু হাস্লেন। বল্লেন, "এই জায়গায় গোল বাধে। সংসারী লোকের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ। মায়ের আদেশ পালন করা যায়—কি যায় না, সে সম্বন্ধে নিজের মনেও জেরা কর, মায়িক লোকের অনুমতিরও অপেক্ষা রাখ। এ তোমার একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা হ'লেও মায়েরও অবহেলার কারণ। শুধু অম্বলের অসুখ নয়, সকল ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধেই আমার মারফতে মায়ের কাছে একটা আদানপ্রদান তোমার চল্‌ছে। তুমি এখন বস্তুজগৎ ছাড়া। যদি ইচ্ছা কর, তোমার স্বামীকে আমি জানাতে পারি। কিন্তু মায়ের কৃপা পাবে কি না সন্দেহ। স্বামীর অস্বীকৃতির দরুণ এ সুযোগ ব্যর্থ

হতে পারে। আবার হয় ত তোমার প্রার্থনার মধ্যে অপর্য্যাপ্ত আগ্রহ নেই, এ কারণেও ব্যর্থ হতে পারে। ভেবে দেখ, এ সৌভাগ্য ত্যাগ করবে কি না ?”

কেতকী বল্‌লে, “খবর পর্য্যন্ত না দিয়ে গেলে তিনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ?”

বাবা হাস্য করলেন। বল্‌লেন, “আমার কথায় বোধ করি মনোযোগ করনি। এই প্রশ্নেরই উত্তর কেবলমাত্র দিয়েছি। আমার শক্তি অতি সামান্য। তোমার সম্বন্ধে তিন দিনের চেষ্টায় কিছু ফল ফলেছে। বলেইছি ত তুমি এখন বস্তুজগৎ ছাড়া। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সকল আকর্ষণের সকল প্রলোভনের অতীত হও। মঙ্গল হবে। প্রয়াগে গেলেই বিল্বপত্র পাবে, বিলম্ব হবে না। তখন আমার শিষ্যেরা কেহ গিয়ে তোমাকে ঠিকানায় পৌছে দিয়ে আস্‌তে পারবে। না হয় তোমার স্বামীকেও সে সময় খবর দিয়ে আনতে পারা যাবে।”

কেতকী বল্‌লে, “আচ্ছা।”

নির্জ্জন ঘরের পিছনেই আমকাঁঠালের একটা বাগান। বাবা পিছনের দরজা দিয়ে সেখানে ঢুকলেন। কেতকী পিছু পিছু গেল। তথায় গোযানে জিনিসপত্র সজ্জিত হচ্ছিল। বাবা সকলকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন এবং অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী একটা ষ্টেশনে এসে ষ্টীমার ধরলেন।

এদিকে কেতকীকে কাছছাড়া করা অবধি বিরাজের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ছম্‌ছমে গুমোট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল—যেন বছরের মত দীর্ঘ! অথচ অম্বলের ঔষধের ফর্দ্দটা তার এ পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। বিরাজ আর অপেক্ষা না করে নির্জ্জন ঘরটির দিকে ছুটে গেল। দরজার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সে কান পেতে রাখলে। সাড়াশব্দ নেই—মৃত্যুর মত নির্ব্বাক। আকাশের ওই বড়

তারাটা বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে এখনই যেন সরে পড়বে, সেই উদ্যোগ করছে। বাতাস যেন একটা কুৎসিৎ সংবাদ প্রচার করতে ঘরটার চারিপাশে জোট পাকিয়ে আটকে রয়ে গেল। বিরাজের মনে কত প্রশ্ন, কত শঙ্কা—সমাধান কিছু নেই। স্বামীজী তিনি—ধর্ম্মেরই জীবন তাঁর—ভাবতে আর ভাল লাগছিল না। সে বেড়া টপকিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখলে নির্জ্জন কক্ষের পিছনে দরজাটা খোলা। সে অতি দ্রুত ভিতরে ঢুকে পড়ল। একটা বিরাট শূন্যতা হি হি শব্দে বিকট হাসি হেসে তাকে যেন অভিনন্দিত করলে। কোথায় ব্যাঘ্র-চর্ম্ম—কোথায় কমণ্ডলু—আর কোথায় কম্বল চিম্‌টা। কেবল তাকে পাগল করে তুলতে নিকষ কালো বিকৃত অন্ধকার ঘরটি জুড়ে আড়ি পেতে রয়েছে। বিরাজের দেহের রক্ত জল হয়ে মাটি ভিজতে লাগল।

কতক্ষণ এ ভাবে কাটল জ্ঞান ছিল না। চেতনা ফিরলে ব্যাকুলভাবে ছুটে নাটমণ্ডপে পড়ে যারা ঘুমুচ্ছিল সকলকে এসে সে সচেতন করে তুললে। তাহার ভয়ার্ত্ত মুখের কাহিনী শুনে সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়ে গেল। বাগানের পথে ঘরে ঢুকে সকলে দেখলে,—সত্যই পাখী উড়েছে!

একান্ত নিরুপায় হয়ে বিরাজ তখন ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে চলে এল। ষ্টীমার তখন ঘাট ছেড়ে চলে গেছে। সে হাঁটু গেড়ে সেইখানে বসে পড়ল।

তখন সকাল হয়েছে। অনেক লোকজন এসে জমে গেছে। সকলে যুক্তি করে একখানা ডিঙ্গি নৌকায় তাকে তুলে দিলে এবং খালের পথে সোজা গিয়ে ষ্টীমার পৌঁছানোর পূর্ব্বে তাকে রেল ষ্টীমারের সঙ্গমস্থলের ষ্টেশনটি ধরিয়ে দিতে পারে মাঝিমাল্লাদের সকলকে উপদেশ দিয়ে দিলে। নৌকা খরবেগে ছুটে চলল। বিরাজ নৌকার মধ্যে স্তব্ধভাবে বসে এই দুর্জ্জের মর্ম্মপীড়া উপভোগ করতে লাগল।

বিরাজের নৌকা যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছল তখন ষ্টীমার এসে গেছে। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। সে ডাঙ্গায় পা দিতেই দেখতে পেলে বাবার একটি চেলা এক লোটা জল নিয়ে গাড়িতে উঠছে। টিকিট কেনার আর খেয়ালও হ'ল না—সময়ও ছিল না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে চলন্ত গাড়ীটার হাতল ধরতে পুলিশের একটি লোক তার হাত চেপে ধরলে। বিরাজ 'হাউ হাউ' করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমাকে ছাড় বাবু! আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে ওই চল্‌ল—পালিয়ে চল্‌ল।"

বাবুটি পুলিশের একজন ইনস্পেক্টার। বিরাজের হাত ছেড়ে দিলেন। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বস্‌লেন। গাড়ী তখন চল্‌তে আরম্ভ করেছে। একটু স্থির হয়ে বসার পর বাবুটি জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি হয়েছে আপনার এইবার গুছিয়ে বলুন দিকিনি?"

বাষ্পোচ্ছ্বাসে বিরাজের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। গলাটা ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে সে বল্‌লে, "আর হয়েছে—হতভাগা—রাস্কেল—গর্দ্দভ—আহাম্মক—"

এই বলে সে নিজের গালে নিজে চপেটাঘাত করতে লাগল।

ইনস্পেক্টর হাস্য করে বল্‌লেন, "ক্ষেপে গেলেন যে, বাবু! গাড়ীতে ত সঙ্গী করেই নিলেন। আবার পাগলা গারদ পর্য্যন্ত ভোগাবেন না কি? আমার ত সময় কম।"

বিরাজ দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "সময় আমার খুব বেশী! বেটা সাধু—তৈলঙ্গস্বামী। বুকে শ্লেষ্মা—মুখে বব-বম ও কি কখ্‌খনো ফোটে? আর তোমরা হয়েছ গিয়ে ওদের মাসতুতো ভাই।"

একদল শিষ্য সঙ্গে একজন সাধুকে এই গাড়ীতে উঠতে ইনস্পেক্টর দেখেছিলেন। এইখানেই বিরাজের সম্পর্ক তিনি অনুমান করে নিলেন। বল্‌লেন "কেন, মাসতুতো ভাই হলাম কিসে?"

'না—কেন ? এই আমার উপর দরদ দেখাচ্ছ। জোচ্চুরির পয়সা—বেটার ত অভাব নেই। গেঁজের টাকাটা ঘোমটার ফাঁকে মুচকি হাসার মত দেখিয়ে দিলে চোঁয়া ঢেকুরটা আমারই নাকের ছেঁদা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে। এই চিৎ—এই কাৎ—এই ত হ'ল ব্যবসা তোমাদের গিয়ে।"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, তাই ত পয়সার মায়া কাটাতে পারিনে। আপনি কিছু ঝাড়ুন না ? চিৎটা বজায় থেকে যাক।"

বিরাজ বল্লে, "ঝেড়ে ত দিলুম। এত পাপের বোঝা টেনে বেড়াচ্ছ আখেরে ছেলেপুলে কি ও পাপ ঘাড়ে নেবে ? বলবে,—বাবা, তুমি একটু জিরোও ? বালককালে রত্নাকরের গল্পটাও পড়নি !"

"নাই বা নিলে। সন্তান তারা, সমস্ত বোঝাটা না হয় আমরাই নিলুম !"

বিরাজ ভেবে দেখলে লোকটাকে হাতছাড়া করলে ফল বড় শুভ হবে না। দৈবাৎ যদি জুটে গেছে, সোজা পাকে রাখাই ভাল। কিন্তু পেটের ঠাঁই যে অনেক। হিড়িম্বা রাক্ষসী। বললে, "কি চাও, বল। নোটফোটের কথা পেড় না যেন। পেটের ক্ষিধে বাড়ালে পেরে উঠব না।"

ইনস্পেক্টর মুচকি হেসে বললেন, "ক্ষিধে ত খুবই। আপনি যে দাতা, বিড়ি সিগারেটের পয়সাটা হ'লেই কৃতার্থ হব।"

বিরাজের সমস্ত দেহে গোটা চল্লিশেক টাকা ছড়ানো ছিল। কতক কাছায়—কতক কোঁচায—কতক কোমরের গেঁজেয়—কতক পকেটে। সকল দিকটায় হাতড়ে টিপে টিপে দেখে নিরাশ হয়ে সে বললে, "সবই যে আস্ত ? টাকা না ধোঁয়া—ভেঙেছ, না উড়েছে। আচ্ছা ! দাঁড়াও—"

এই বলে সে বুকপকেটটা হাতড়ে একটা সিকি টেনে বের করে জিজ্ঞাসা করলে, "পথে কিছু খাবার খাব বলে সিকিটে ছিল, তা' তোমার গিয়ে সিগারেটের দাম কত ?"

"বেশী না—দশ পয়সা।"

"তা হ'লে থাকছে গিয়ে ছ' পয়সা। খুচরো পয়সা আছে তোমার কাছে ? থাকে ত ছটা পয়সা দাও। ক্ষিধে তেষ্টা ত চুলোয় গেছে। মনে করব'খন দশ পয়সার কলা কিনে খেয়েছি।"

"কিন্তু যে আপনাকে কলা দেখালে তার গল্পটা ত এখনও শোনা হয়নি। পয়সা এখন থাক্। সিগারেট যা আছে, আপাততঃ চলবে।"

হেসে কেস্ হতে একটা সিগারেট টেনে বের করে তিনি আগুন ধরালেন। বিরাজ খুসী হয়ে সিকিটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলে। বললে, -'মেজাজের কি আমার ঠিক আছে ?. পাজি-জোচ্চর—জরদ্গব—পাক মেরে কি না মাথার উপরে ছোঁ ?"

"গালিটা এখন থাক, গল্পটাই আগে বলুন। পরের ষ্টেশনে এখুনি গাড়ী ধরবে। তার আগে আপনার বক্তব্য শোনা চাই। দেখি, যদি কিছু করা যায়।"

বিরাজের কাছে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "গাড়ী থামলে আপনি যদি আপনার স্ত্রীর অনুসন্ধানে ছুটোছুটি করেন, আমি কিছুই করতে পারব না। সামনের ষ্টেশনে নেমে আমি কলকাতার পুলিশকে সদলবলে সজ্জিত থাকতে তার করব। সেইখানে ওদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই সময়টা চাদর মুড়ি দিয়ে বেঞ্চের উপর শিষ্ট ছেলের মত নাকসিটকে পড়ে থাকুন দিকিনি! কাকেও মুখ দেখাবেন না যেন। বুঝলেন ?"

"বুঝব না কেন ? শঠ ছেড়ে স্যাকরার হাতে পড়েছি, যেদিকে দমাবে,

সেইদিকে দমতে হবে। বলে,—নিজের জ্বালায় মরে মনসা, বর দিয়ে যা!"

ইনস্পেক্টর দরজাটা ভিতরের দিকে টেনে ধরে বললেন, "তা হলে নাম্‌লুম আমি?"

"নামো। দেশে গিয়ে মুখ ত ঢাকতেই হবে। তুমি দেখি ঘোমটাটা গাড়ীর মধ্যেই টেনে দিচ্ছ। নিধের বোঝা সিধে নিয়ে পালাবে না ত? তুমি ত, বাবা পুলিশের লোক!"

"পুলিশের উপর মমতা আপনার খুবই বেশী। যাক্, আমি এই নামলুম। আপনি যেন নেমে পড়বেন না। চাদর মুড়ি দিন।"

তিনি নেমে পড়লেন। বিরাজ আগাগোড়া মুড়ি-সুড়ি দিয়ে পড়ে রইল।

গাড়ীখানা কলিকাতায় পৌঁছিলে বাবা নেমে সঙ্গের লোকজন এবং কেতকীকে নিয়ে ষ্টেশনের একধারে উপবেশন করলেন। কুলীরা জিনিষপত্র নামিয়ে তাঁদের সম্মুখে স্তূপীকৃত করতে লাগল। এদিকে পুলিশের লোকেরা এসে তাঁদের ঘেরাও করে দাঁড়াল।

ইনস্পেক্টরের সঙ্গে বিরাজ তথায় উপস্থিত হ'লে সে আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। রোষে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "পাজী—বদমাস—ডাকু—মুখে চুণকালী দিয়েছিস, শালা!"

কেতকী শশব্যস্তে উঠে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরে সভয়ে বললে, "কাকে কি বলছ? কি সর্ব্বনাশ করছ তুমি, বাবার উপর পেত্যাদেশ হয়েছে পেরাগে গিয়ে আমাকে বিল্বপত্র দিতে।"

"আর আমার উপর পেত্যাদেশ হয়েছে তোমার বাবার কানদুটো টেনে ছিঁড়ে দিতে।"

কেতকীকে এক ধাক্কায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিশের

কর্ত্তাদের সম্মুখেই কেবলরামের কানদুটি দুই হাতের মুঠায় পূরে নিয়ে সে সজোরে মর্দ্দন করতে লাগল।

কেবলের সেই মাস ছয়েকের গুরু যমুনাগিরি ৺চন্দ্রনাথ যাবার মানসে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দূর থেকে একজন সাধুকে বিপন্ন হতে দেখে নিকটে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, "কেবলরাম যে! মর্দ্দনযোগ কাটেনি এখনও?"

বোঝা-পড়া

১

নন্দ ডোমের স্ত্রী মেনকা সহসা একদিন নিশুতি রাত্রে অন্তর্হিত হইল।

নন্দ ধামা-কুলা বুনিত এবং দূরের হাটে সে সকল বিক্রয় করিয়া ঘেমে যেন নেয়ে বাড়ী ফিরিত। তাহার দেহ বেশ মজবুতই ছিল। খাটুনির জন্য সে ভয় করিত না। বেত, বাঁশ আর দা-দড়ি লইয়াই সে দিবারাত্র পড়িয়া থাকিত। কাজেই সংসারে অস্বচ্ছলতা ছিল না। মেনকা বলিত, "কানের ভাঙ্গাচুরো ফুলঝুলগুলো রয়েছে, বেনে ডেকে একটু তোড়জোড় ক'রে দাও না?" নন্দ বলিত—"জোড়া-তালি দিয়ে তোকে পরাব কেন রে? নূতন ঝুম্‌কো গড়তে দিইনি বুঝি ভেবেছিস্? দুটো দিন সবুর কর্—এসে পড়ল ত!" এইরূপে পৈঁছে, তাবিজ, ঝুম্‌কো, মল—এই সকল অলঙ্কারে একে একে সে মেনকার গা হাত পা ছাইয়া ফেলিল। এ সকল করিয়াও তাহার হাতে দু'পয়সা জমিতেছিল। লোকে বলিত—"নন্দ একলা মানুষ হ'লে কি হয়—কাজ ক'রে যেন চার জোড়া হাতে!"

নন্দ হাটে যাইবে। মেনকা ভোর রাত্রে উঠিযা রাঁধিয়া বাড়িয়া যত্ন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিত। আবার ফিরিয়া আসিলে এমন এক টুক্‌রা হাসি ফিন্‌কি দিয়া তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িত যে, নন্দর দেহে আর ক্লান্তি থাকিত না। সে তখনি-তখনি চুপ্‌ড়ি হইতে লিচু, পেয়ারা, আনারস, বা এই রকমের কিছু ক্রয়লব্ধ সামগ্রী বাহির

করিয়া দিয়া ক্ষুধিত নেত্রে মেনকার হাসিটুকুর সঙ্গে বিনিময় করিত। তারপর সৌরভির তলব পড়িত। সে আসিয়া জুটিলে আনন্দ দীপ্তিতে পিতামাতার মুখ দু'খানা উজ্জ্বল হইয়া স্থানটুকু অমৃত-স্পর্শে প্লাবিত হইয়া যাইত। মেনকাকে বুঝিয়া দেখিতে এইটুকুই নন্দর হাতে ছিল।

এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন একটা হাড়সর্ব্বস্ব যুবক আসিয়া নন্দর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হইল; এবং চোখের শুধু নিবিড় চাউনিতে মেনকার জীবন স্বপ্নবিভোর করিয়া দাঁড়াইল।

নন্দর ঘরের মুসুরির দাল এবং টাট্‌কা মাছের ঝোল খাইয়া যখন তাহার দেহটি মেদ-মাংসে পুরিয়া উঠিল, তখন নন্দর আনন্দ দেখে কে? মেনকাকে ডাকিয়া সে বলিল, "দেখ্‌লি মেনি, এমন মনুষ্য-জন্ম দোরে দোরে দুটো ভাতের পেত্যাশী হ'য়ে ক্ষইয়ে ফেলছিল। আর দু'টি মাস যদি ওর মগজে পোকামাকড় না ঢোকে—আমার মতের অপিক্ষে রেখে অমনি ধারা খেটে চলে—নন্দর হেঁসেল চেটে খায়—লোকের এ জিহ্বের নড়াই আমি ঘুচিয়ে দেব। একটুক্‌রো জমী কিন্‌তে পাঁচকুড়ি টাকা—আর ঘর একখানা কুড়ি দুই টাকা হ'লে হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু এই লাভের বস্তুতে ইহার লোভ জন্মিল না। লোভ জন্মিল নন্দর ইজ্জতের উপরে। মেনকার চিত্ত ইতিপূর্ব্বেই সে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে একদিন সংসারটি বেদনায় ভরিয়া দিয়া মেনকাকে লইয়া সে উধাও হইল। নন্দ 'হা' 'হুতাশ' করিল না সত্য, কিন্তু গ্লানিতে তাহার রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ দু'খানার সকল কলরবই যেন থামিয়া গেল।

সৌরভির তখন বয়স হইয়াছে। সে-ও বুক চাপ্‌ড়াইল না। কিন্তু শুধু ঘরে নয়—পথে ঘাটেও যে লজ্জা সে ছড়াইয়া গিয়াছে তাহারই কুণ্ঠায় পিতাপুত্রী উভয়েই যেন তন্দ্রামগ্ন হইয়া রহিল।

পরীর মত রূপ লইয়া নন্দর মেয়ে সৌরভি পাড়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রতিবাসী নারীমহলে পতিপুত্রাদির কারণে একটা শঙ্কার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কি জানি এই রাক্ষসীটার কুনজরে কেহ কোনদিন পড়িয়া যায়! ছোটলোকের মেয়ে হইলে কি হয়—মেয়েটি লেখাপড়া শিখিয়াছে। শ্রী-ছাঁদও আছে। সে যে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বিচিত্র কি!

জমিদার-গৃহিণী কঙ্কাবতী কিছু বেশী ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কুমুদ প্রতিদিন রাণার উপর ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে বসে। সৌরভি ঘাটে না আসা পর্য্যন্ত মাছ-ধরায় তাহার অখণ্ড মনোযোগ দেখা যায়। আসিয়া ঘাট সারিয়া চলিয়া গেলে নাজা পিঠে হঠাৎ খিল ধরিয়া উঠে। চারগুলি এককালে ঝুপঝাপ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে সে বাড়ী ফিরে। ইহাও কঙ্কাবতীর চক্ষু এড়ায় নাই। সৌরভির দৃষ্টিতে ইহা সর্ব্বাগ্রেই পড়িয়াছিল। একদিন সে বলিয়াওছিল, "ফাৎনার দিকে চোখ না রাখলে মাছ পালিয়ে যাবে বাবু।"

কুমুদ ভুল বুঝিল। ভাবিল,—মাছের চারের চেয়ে চোখের চারই দেখি বেশী কাজ করিয়াছে। সে বলিল, "শিকার করা উদ্দেশ্য ত সৌরভি? সে যা' হোক্ একটা কিছু হ'লেই হ'ল।"

সৌরভির চোখমুখ সহসা রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শিকারের অর্থটা ত বুঝলাম না বাবু! বিয়ে করবেন না কি আমাকে?"

কুমুদ বুঝিল,—ন্যাকামি। একটা কি রসিকতার উত্তর দিতে যাইয়া জিহ্বাটি কিন্তু তাহার জড়াইয়া গেল। সৌরভি বলিল, "ডোমের মেয়ে—জাত যাবে। ঘর ছাড়েন ত আপনাদের ত একান্ন পীঠ আছে—তারই এক পীঠে নিয়ে যেয়ে রাখবেন হয়ত। না হয়, জমিদার মানুষ,

পয়সা আছে—ভয় নেই—বাগানের এক কোনে একখানা দোচালা তুলেও সেখানে রাখতে পারেন। এর কোনটা কর্‌বেন বলুন ত ?”

কুমুদ তাকাইয়া দেখিল, সৌরভির চোখ দিয়া অগ্নি-বর্ষণ হইতেছে। সে কিছু দমিয়া গেল। তাহাতে সৌরভির প্রশ্নগুলি—নিরুত্তর করিবারই প্রশ্ন! কাজেই সে চুপ্‌ করিয়া রঁহিল।

সৌরভি পাড়ের চারিটা দিক একবার দেখিয়া লইল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সুবিধে মত এর যে কোন একটা পথ আপনি ধরবেন। এ খুব সত্যি কথা। কিন্তু নিজের ঘরের মেয়েদের মধ্যে এই রকমের কিছু দেখতে কি আপনি পছন্দ করেন? না—ডোমের মেয়ের আর মর্য্যাদা কি!”

এই বলিয়া আর বিলম্বমাত্র না করিয়া জলন্ত চোখে আগুনের হল্‌কা বিচ্ছুরিত করিতে করিতে কুমুদকে যেন সেইখানে মৃত্তিকাস্তূপের নীচে সমাহিত করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

সৌরভিকে সাধারণ কথায় বলিতে গেলে—ঠোঁট-কাটা মেয়ে। তাহার অন্তরে যাহা সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠে তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়া সৌজন্য প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নয়। ক্রোধের সঙ্গে ভয় মিশাইয়া চলিতে কোনদিন সে শিখে নাই। মোট কথা, রাখিয়া ঢাকিয়া সহ্য করিয়া চলিবার মেয়েই সে নয়।

কুমুদ কিন্তু ছিপ লইয়া আবার আসিয়া মাছ ধরিতে বসিতেছে, এবং কুৎসিৎ চাহনিতে মেয়েটির দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য লেহন করিয়া লইতেছে। সংসারে শক্তিমানের উপর প্রশ্ন নাই—শাসন নাই—কাজেই তাহাদের যথেচ্ছাচারিতা নিষ্কণ্টক। এ যেন তাহাদের সম্প্রদায়গত অবাধ অধিকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সৌরভি পারত পক্ষে ঘাটে আসে না। যখন আসে কুমুদকে

দেখিতে পায়। এবং সে সময়ে কুমুদ চক্ষু-গোলকের দ্বারা কত কি পুনরাবৃত্তি করে।

কিন্তু সেদিন যখন ঘাটের পাড়ে এক হাট বৌ-ঝির মধ্যে জমিদার-গৃহিণী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা এখন কোথায় রাজত্ব কর্‌ছে রে সৌরভি?" তখন নিজের জাতির উপর মেয়েদের এই বৃহৎ ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া সৌরভি ক্ষণকাল বিস্ময়ে এমন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল যে, শ্বাস-গ্রহণের চারিদিককার বায়ুটুকু পর্য্যন্ত যেন তাহার কাছে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। এরূপ আঘাত অনেক সময় অনেকে করিতেন। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল, তাহার এই দীর্ঘ কুমারীকাল লইয়া যতদিন এই গ্রামে বসিয়া সে দিন গণিবে, ততদিন তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সে তৎপর হইয়া উত্তর করিল, "সে ত সীমার বাহিরে চ'লে গেছে ঠাকুরমা! রাজত্ব ত অনেকে ঘরে ব'সেও করে। ঘরের হিসাবটা আগে রাখলে উপকার বেশী হয়।"

স্বল্প কথায় সৌরভি যেন সকলকে অতিক্রম করিয়া গেল। জমিদার-গৃহিণী চাহিয়া দেখিলেন, আশ-পাশের মেয়েরা সকলেই এই তুচ্ছ মেয়েটির সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেছে। কিন্তু সকলকারই চক্ষের জ্বলন্ত রশ্মি যেন তিরস্কারের আকারে ইহার সমস্ত দেহের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি আহত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ছুঁড়ীর সাহস দেখ! বড় যে ট্যাস্‌টেসে কথা শিখেছিস?" এই বলিয়া তিনি ক্রোধের কতকটা চোখ দিয়া ছাড়িয়া নিজকে সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "নন্দর বুঝি চোখ পড়ে না তোর উপর? বয়সের ত গাছ পাথর নেই। কতকাল আর ঘরে পুষে রাখবে তোকে? তোদের জেঁতেরও বলিহারি বাছা! শেষটা মার মত কুলে কালি দিবি

না কি? না—ভিটে আগলে ব'সে ব'সে পাড়ার কচি ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাবি?"

তরুণী বধূরা নিজ নিজ স্বামী-দেবতার আশঙ্কায় বলিয়া উঠিলেন, "এ আপদ এক্ষুনি গাঁ-ছাড়া করুন আপনি। বর ত ওর রাস্তা-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

এ প্রশ্নের জবাব সৌরভি সহসা দিতে পারিল না। ছেলেকে এই ঘাটের পাড়েই তাহার উপর নজর দিতে দেখিয়া কঙ্কাবতী মনে মনে বিরক্ত হইতেন, সে ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ছেলেকে শাসন না করিয়া মেয়ে হইয়া অপর মেয়েকে অযথা আঘাত করিয়া মেয়েদের সম্ভ্রম যে ইহারা ক্ষুণ্ণ করিলেন—তাহা যেন তাঁহার চোখেই পড়িল না। যে থালাখানা তুঁষ বালির দ্বারা সে ঘসিতেছিল, তাহার উপর হাতের চতুর্গুণ জোর দিয়া ঘসিতে ঘসিতে ঘাড় নীচু করিয়া সে বলিতে লাগিল, "মাথার খুলির চেয়ে দাঁতের জোর যদি বেশী হয়—চিবিয়ে খাব না ত কি!"

এই বলিয়া ধপাস্ ধপাস্ করিয়া থালা ক'খানা জলের উপর আছড়াইয়া একত্র করিয়া জোর পায়ে সে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত পথটাই এই অনুশোচনায় তাহাকে বিঁধিতেছিল যে, এই রূঢ়-ভাষিণীর ছেলেটির আচরণ ধরিয়া আরও কত কথা শুনাইয়া আসিতে যেন রহিয়া গেছে।

নন্দ তখন নিড়েন দ্বারা একটা কুমড়াগাছের গোড়া পরিষ্কার করিতেছিল। সৌরভি দাওয়ার উপর বাসনের ঝাঁকাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বলিল, "অত মেহনত কচ্ছ, ঐ গাছের ফল খাবে নাকি তুমি? তার চেয়ে ডগাগুলো কেটে দাও, চচ্চড়ি বেঁধে দি।"

মেয়ের দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া নন্দ তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইবার

চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছটির বৃদ্ধির কামনায় কালও ইহার গোড়ায় কলস কলস জল ঢালিতে যাহার আগ্রহের অবধি ছিল না, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সে কেন তাহার ডগাগুলির মাথা লইবার তাগিদ দিতেছে ঠিক ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, "গাছের ধাত ত বেশ ভালই আছে। ফল ধরবে না, কে বললে তোকে ?"

সৌরভি বলিল, "ফল আর খেয়েছ তুমি। সমস্ত অপযশের বোঝাটা ত তোমার আর আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে চ'লে গেল সে। চল, বন জঙ্গলে গিয়ে বাস করি। আমার আর এ সহ্য হয় না।"

হাতের নিড়েনটা ফেলিয়া রাখিয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "অপযশ যে কিনলে সে ত ঘরে নেই। তোর বোঝা ভারি হ'ল কিসে ? অপযের কালি তোতে যেয়ে পৌছায় কি ক'রে ?"

"কি জানি, কি ক'রে পৌছয় বাবা !"

এই বলিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুটি দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

নন্দ চোখ রাঙ্গাইয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু মেনকার শোকটা এ সময় তাহার মনের মধ্যে আগাগোড়া তোলপাড় করিয়া উঠিতে লাগিল। মেয়েটির চোখের জলের উৎস-মুখ সেই-ই যে ভাল করিয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইত। তাহাকে ভুলিল সে কিসের জোরে ? নিড়েনটা সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া ধুলিহস্তে সে দাওয়ার উপর আসিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "দেহটার মত পরাণটাও যে শক্ত—মনে এ দেমাক আমার ছিল। সে ত মিথ্যে হবে গেল। ঘরের আঁধার তুই যদি মুখ ভারি ক'রে বড় ক'রে তুলবি, আমি দাঁড়াই কোনখানে ?"

সৌরভি কোন কথা বলিল না। ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। হাতের

তালুতে কিছু নারিকেলের তৈল ঢালিয়া লইয়া মাথায় ঘসিতে ঘসিতে পুনর্ব্বার সে বাহির হইয়া আসিল। এবং আলিসার উপর যে জলের কলস ছিল, তাহা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ঘটি দুই জল মাথায় ঢালিয়া সে বস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল।

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাটে গেলিনে ?"

সৌরভি সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ঘাটের পাড়ে কাঁটা পড়েছে যে ?"

এই বলিয়া চুলের ডগায় একটা গ্রন্থি বাঁধিয়া - চাঙারি বুনিবার জন্য যে চটা চাঁছা ছিল, হাতে পায়ে তাহাই মড় মড় শব্দে সে ভাঙ্গিতে লাগিল।

নন্দ কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, "বুদ্ধি শুদ্ধি হারালি নাকি তুই ? ও-গুলো দিয়ে চাঙারি বুনব যে !"

সৌরভি আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। বলিল, "এখন চুলোয় ত দি। চাঙারি বোনার সময় হবে না। আর চাল চিঁড়ের মত পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিয়েও যাওয়া যাবে না।"

নন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেয়েটির এই অচিন্তিত আচরণ কি যেন একটা দুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছে। একটা বৃহৎ আঘাতের গভীরতা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া অকস্মাৎ সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সৌরভি তখন ঘরে ঢুকিয়া উনুন ধরাইতেছিল। নন্দ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া—কবাট ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে কি কেউ কিছু বলেছে সৌরভি ?"

সৌরভি তখন আপনাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেকটা সম্বরণ করিয়া ফেলিয়াছিল। পিতাকেও সে জানিত। তাই এ প্রসঙ্গ বাড়াইতে সে আর ইচ্ছুক হইল না। কড়ায় খানিকটা তেল ঢালিয়া তরকারি পত্র নাড়া চাড়ার দ্বারা 'ছ্যাক' 'ছ্যাক' শব্দের মধ্যে আলোচনাটা

তলাইয়া দিতে সে চেষ্টা করিল। শুধু বলিল, "রান্নাটা শেষ হ'তে দাও বাবা! এখনও কিছুমাত্র গুছিয়ে নিতে পারি নি।"

নন্দ বুঝিল, ইহার অধিক কিছু ইহার কাছে মিলিবে না। কিছুক্ষণ মৌন হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাঁশের লাঠিখানা দ্বারের আড়াল হইতে সে টানিয়া লইল। বলিল, "তোর বাবা গরীব, আর জেতে ছোট—তাই ঠাওর করেছিস বুঝি বড় লোকের ডরে তোর অপমানটাও আমার কাছে ছোট? দাঁড়া, একবার পুকুর ঘাটটা ঘুরে আসি।"

এই বলিয়া নন্দ দ্রুতগতি বাহির হইয়া গেল। সৌরভি রান্না ফেলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল, এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। নন্দ সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। সৌরভির বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

নন্দ ঘাটে আসিয়া দেখিল, ঘাটটি শূন্য—লোকজন নাই। সে একবার পাড়টা ঘুরিয়া আসিল। ইচ্ছা—কন্যার এই মনোভাবের যদি কিছু হেতু ধরিতে পারা যায়। সে একে স্পষ্টবাদী লোক, তাহাতে শক্তিও প্রচুর, লোকে তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। গাঁয়ের অনেকেরই সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু কাহারও মুখে কোন কিছুর আভাস সে পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, সৌরভির রান্না হইয়া গিয়াছে, জিনিষ পত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতেছে। ফিরিয়া আসা পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিয়া থাকা চলে নাই। ঝোঁকের মাথায় যে ইঙ্গিত সে তখন করিল, তাহার ভিতর এতটা দৃঢ়তাই ছিল। সৌরভির একান্ত পরিচিত অচঞ্চল আচরণের কথা ভাবিয়া নন্দর মনে তখন এই আতঙ্ক উঠিতে লাগিল যে, এই বাঁধা-ছাঁদার পর ইহাকে থামাইয়া দিতে কোন হিতোপদেশই কাজে লাগিবে না। কিন্তু গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র উঠিয়া গেলে সে যে কোন্ অজ্ঞাত স্থান

নির্দ্দেশ করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে অনুমতি করিবে এই আশঙ্কায় নন্দ যেমন চঞ্চল হইল, ঘর ছাড়িবার সংকল্পে মেয়েটি সহসা কেন যে এমন দৃঢ় হইয়া উঠিল সে প্রশ্নটাও তেমনি মনের মধ্যে বার বার ধাক্কা দিয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। সে ঘরে উঠিয়া সেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে আসন পাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "কে তোকে কি বলেছে, না বল্‌লে ত এক পাও নড়্‌তে পারিনে আমি। কায়েত বামুন হোক্ আর জমিদার লোকই হোক্, নামটা তুই বলে' দে, তার মাংস চিরে নুন বসিয়ে দিয়ে আমি নড়ি।"

সৌরভির হাতের কাজ বন্ধ হইল না। একটা ছালার ভিতর হাতা বেড়ি, হুঁকা কলিকা, পানের সজ্জা, তেলের বোতল; দড়াদড়ি কত কি পুরিতে পুরিতে সে বলিল, "মনের মধ্যে রাত্তির দিন লড়াই কর্‌ছ তুমি—আবার মানুষের সঙ্গেও লড়্‌বে? একটু সুখ শান্তি খোঁজা যে তার চেয়ে ঢের ভাল।"

নন্দ আর কোন কথা না বলিয়া সেইখানে বসিয়া বসিয়া সৌরভির কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। সৌরভি হুঁকা কলিকাটা আবার টানিয়া বাহির করিয়া তামাক সাজিয়া পিতার হস্তে দিল। তখনকার কাজ চলার মত কলার পাতা কাটিয়া রাখিয়া বাসনকোসনগুলি মাজিয়া ঘসিয়া সে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। সেগুলি সেই বস্তার মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তোরঙ্গটি ইতিপূর্ব্বেই সাজান হইয়া গিয়াছিল।

ভিটার সঙ্গে মেয়েটি এই যে সর্ব্বপ্রকার দাবী উঠাইয়া লইতেছে ইহাতে সত্য সত্যই নন্দ একটা নিশ্বাস ছাড়িল। সে বলিল, "কিন্তু কোথায় যাবি ভেবে দেখেছিস্ ত?"

সৌরভি বলিল, "পিসিমার বাড়ী ছিল—জেঠাত বোনেরও বাড়ী ঘর ছিল, সে ত যাব না। সে গেলে ভাব্‌বার সময় অনেকটা লাগ্‌ত;

এ আর সে বালাই নেই। খেয়ে দেয়ে গাড়ী একখানা তুমি ডেকে আন, বেলাবেলি যতটা পারি এগিয়ে নিই।”

নন্দ বলিল, “কোথায় গিয়ে থাম্‌বি তুই, যে গাড়ী চালাবে সে ত জান্‌তে চাইবে। তা'কে কি বলে' কাজে লাগাবি?”

সৌরভি বলিল, “অত ভাবতে গেলে এখানে ব'সে ব'সে লোকের ঝাঁটা লাথি খেতে হবে। গাড়ী তুমি আন, চুক্তি পত্তর যা' করতে হয় আমি কর্‌ব—তোমার ভাবনা নেই।” এই বলিয়া সে থামিল। তারপর বলিল, “কিন্তু সব চেয়ে ভাল ছিল দু'জনার মাথার দুটি পুঁটলি ছাড়া বাকি সব পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে যাওয়া।”

নন্দ কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল,—“তোরঙ্গটা একবার খুলবি মা?”

সৌরভি তালাটা খুলিয়া দিল। মেনকার যে সকল পোষাকী কাপড় জামা পাটে পাটে গোছান ছিল, নন্দ সে সকল টানিয়া বাহির করিল, এবং এক জায়গায় স্তূপাকার করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

সৌরভি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—“সত্যি সত্যি একি করলে বাবা?”

নন্দ বলিল,—“এ ভালই হ'ল সৌরভি। এ সব তুই পরবিনে সে আমি জানি। আলগা যদি হলি—বোঝা ভারি করিস্ কেন?”

মায়ের এই সকল পরিত্যক্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতে তাহারও মনে ঘৃণা হইতেছিল। যে সকল বাহুল্য জিনিসপত্র সে ইতিপূর্ব্বে গুছাইয়া লইয়াছিল, এখন তাহাও টানিয়া বাহির করিয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল, বিছানা ও জিনিস-পত্তর একটা ঘরে তালা-বন্ধ করিয়া রাখিল।

নন্দ ঝিম্ মারিয়া বসিয়া রহিল। পরে চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বলিল, “কুমড়োর ডগাগুলো বেঁধে দিস্‌নি ভালই করেছিস্।

ওর বিচিগুলো তোর হাতে পোঁতাও না—আমার হাতেরও না।"

সৌরভি বুঝিল, পিতার অন্তরের নিবিড় ব্যথা যাহা এতদিন শুধু অনুভব করিবার ছিল, এখন যেন তাহা রূপ ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

নন্দ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। বলিল, "দিনের বেলা ভিটে ছাড়বার উয্‌যুগ করলি, তাতে যত লজ্জা না—লোকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে পরাণটা নাজেহাল হবে—আর লজ্জায় ম'রে যাব। রেতের বেলা গেলে হয় না?"

সৌরভি বলিল, "তাই যাব।"

৩

সৌরভি দেখিল, সংসারে তখনও কিছু জলের প্রয়োজন আছে। কলস ক'টি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, এক ফোঁটা জলও নাই। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সে জল আনিতে চলিল। কিন্তু ঘাটের সিঁড়ির উপর পা দিতেই সে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দেখিল, কঙ্কাবতী জলে কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেছেন। সে আর তথায় না নামিয়া আঘাটায় কলস ডুবাইয়া জল পুরিতে লাগিল। কলসের বক্‌ বক্‌ শব্দে কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে উত্তর করিল, "আমি সৌরভি।"

"রেতের বেলা ঘাটে এলি যে? দিনে সময় পাস্‌নে? এই ডপ্‌ডপে বয়েস—ধন্যি সাহস তোর বাপের। একবার ঘা খেয়েও হুঁস হয় না? সাঁজ-সন্ধ্যে হাওয়া খেতে ছেলেগুলো সিঁড়ির উপর এসে বসে, দেখতে ভাল লাগে বুঝি?"

সৌরভি উত্তর করিল ; বলিল, "আমার পিছু এমনি ক'রে লাগলেন, কিন্তু কি করেছি আমি আপনাদের ? বয়েস ত আমার হাতে নয় যে, ঠেসেঠুসে ছোট ক'রে রাখব ? আমার দেখতে ভাল লাগে কি যারা ঘাটে এসে বসে তাদের লাগে, বিচার ক'রে দেখলে ত পারেন।"

কঙ্কাবতী চটিয়া গেলেন। সক্রোধে বলিলেন, "মুখের উপর ঠোঁট কাটিস্—আঃ মলো! সাহস দেখ। তবু যদি সতী মায়ের মেয়ে হতিস্!"

সৌরভির গা জ্বালা করিয়া উঠিল। বলিল, "অসতীর মেয়ে কিনা আপনি ভাল জানেন না। কিন্তু আপনাদের পাড়াতেই আমি বাস করি। এটা ভাল জানেন যে, আমার জন্মের গোড়ায় কোন কালি নেই। অকারণ যে ব্যথা আমাকে আর আমার বাবাকে আপনারা দিচ্ছেন, এর চেয়ে বড় পাপ সংসারে আর কিছু নেই।"

এই বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। গৃহ-ত্যাগের বিধি-ব্যবস্থা সে যে পূর্ব্বক্ষণে সারিয়া ফেলিতে পারিয়াছে ইহাতে সে মনে মনে আরাম বোধ করিতে লাগিল।

বাড়ী আসিয়া বাকী কাজগুলি সে সারিয়া সুরিয়া লইল। অবশেষে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ফেলিয়া বলিল, "এইবার ওঠ বাবা!"

সৌরভি লেখাপড়া জানে—তার ভিতরে বুদ্ধি আছে, যুক্তি আছে, বিচার আছে, এ কথা নন্দ বিশ্বাস করিত। মেয়ের গৌরবও সে করিত —তাহাকে ভালও বাসিত। সে যখন 'গোঁ' ধরিয়াছে তখন গৃহত্যাগ তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু সে যে হঠাৎ সমস্ত সুখ ও স্বার্থ স্বেচ্ছায় কেন বিসর্জ্জন দিতে বসিল—এ অজানিত পীড়ন বহন করা দুঃসহ। বাসনের ঝাঁকাটা ঠেস্ দিয়া অথর্ব্বের মত সে সেখানে এলাইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "ঘর ছাড়তে পারলে আমিও বেঁচে যাই। কিন্তু

এ নাগাত ত কথা পাড়িস নি—ঘাটে যাবার বেলাও কিছু বলিসনি—বেশ হাসি খুসিতেই গেলি। গাঁ-টা এখনও কিন্তু আমি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে পারি।”

সৌরভির কাছে কোন উত্তর না পাইয়া সে বলিল, “তোর ভবিষ্যৎটা আর দু’দিন ঘরে ব’সে ভাবতেও ত দিলিনে।”

সৌরভি বলিল, “এখানে ব’সে ভাবতে লোকে ফুরসৎ দেবে না। তুমি উঠে এস বাবা!”

সৌরভি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে নন্দ দেখিত। কিন্তু তাহাকে পরের ঘরে দিতে হইবে মনে হইলেই প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত। দু’এক জায়গায় সম্বন্ধ করিতে যাইয়া সামনা সামনি কিছু না শুনিলেও তাহার কানে যাহা পড়িয়াছে তাহার ভীষণতা কল্পনারও অগম্য। তাই বিষয়টী আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

যাহা হউক নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, “কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব ত মিট্‌ল না মা! এখনও বল তোর গায়ে কেউ আঁচড় কেটেছে কিনা? যাবার আগে দেহটা তার টুকরো টুকরো ক’রে রেখে যাই।”

সবেগে মাথা নাড়া দিয়া সৌরভি বলিল, “সে সাধ্যি কারু নেই বাবা, সে সব কিছু নয়। কিন্তু এ বাড়ীটা দুষে গেছে—এখানে বাস করলে মঙ্গল হবে না।”

নন্দ বাড়ীখানা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। তারপর বাসনের ঝাঁকাটা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, “তোরঙ্গটা নিতে তোর কষ্ট হবে না।”

সৌরভি বলিল, “না ও হাল্‌কা আছে।”

তারপর পিতাপুত্রী নিঃশব্দ দ্রুতপদ-সঞ্চারে গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

৪

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। খণ্ড খণ্ড মেঘে কখনও ঢাকিতেছে—কখনও ছাড়িয়া দিতেছে। নানারূপ চিন্তাভারে ক্ষিপ্ত হইয়া, কখন বসিয়া—কখন চলিয়া—সমস্ত রাত্রিটা ইহারা পথ চলিল।

সৌরভি বলিয়াছিল, লোকালয়ে থাকা হইবে না, কোন বন-জঙ্গলে যাইয়া বাস করিবে। ঘটিলও তাই। সকালে এক চল্‌তি নৌকায় ইহারা উঠিয়া পড়িল। নৌকারোহীরা সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাইতেছিল।

ইহারা যে স্থানটায় নামিল সেখানে গভীর জঙ্গল। সুন্দরবনের অংশ-বিশেষ। নিকটে বন-বিভাগের একটা আফিস। নদীর পরপারে লোকালয়।

বনের মধ্যে পোঁটলা-পুঁটুলি খুলিয়া সৌরভি যাহা রাঁধিল, নন্দর কাছে তাহা উপাদেয় ঠেকিল। উপরে গাছের শাখা-প্রশাখা পাতায় পাতায় মিশানো। নীচে ঝাঁট্‌ পাট দিয়া পিতাকে সে কম্বল বিছাইয়া দিল। ছোট ছোট চারাগাছের ডগায় কাপড়-চোপড়, তৈজস-পত্র ঝুলিতেছে—শৃঙ্খলাবদ্ধ। নিকটেই রান্নার স্থান—পরিপাটি। নদী বেশী দূরে নয়। বাসনগুলি নদীর ঘাটে লইয়া মাজিয়া ঘসিয়া সে ঝকঝকে করিয়া আনিয়াছে এবং সেগুলি সাজাইয়া রাখিবার জন্যে ইতিমধ্যে একখানা মাচাও প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপে আকাশের তলদেশে মুক্তির হাওয়ার মধ্যে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল।

বন-ক্লেশের এই দুঃখটুকু তাহারই হাতের এবং অকারণে দেওয়া—পাছে পিতার প্রাণে এই আঘাত বাজে—এই ব্যস্ততায় তাহার হাতের জোর যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সে একা হাতেই এই নির্জ্জন দেশে সরস গৃহস্থালী পাতাইয়া ফেলিল।

খাওয়া দাওয়ার পর একদিন সে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল, "বাঘ ভালুক বনের পশু এখানে যে রয়েছে—সত্যি কথা, কিন্তু মানুষের মত তত বড় হিংসে এদের নেই। তোমার মনে এখনও কি দুঃখ আছে বাবা?"

"না মা, দুঃখ আর কিছুই নেই।"

কিন্তু একথা ঠিক সত্য নহে। নন্দর হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা—মেনকার তপ্ত-স্মৃতি—ভিতরে ভিতরে যে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সৌরভির সুষ্ঠু হস্তের সেবা-যত্নে হয়ত তাহা ঢাকা পড়িতে পারিত কিন্তু মেয়েটির রূপ ও যৌবন যে দিন দিন বাড়িতেছে, এ যৌবনের গতি কি হইবে—এ প্রশ্নের কোন উত্তরই তাহার মাথায় আসিত না। সৌরভির শুষ্ক চোখের জমাট-অশ্রু চোখে দেখা যাইত না, কিন্তু নন্দ ত জানিত কোথায় কি সঞ্চিত আছে! কাহাকেও ছোট করিয়া রাখিতে দিবারাত্রি চব্বিশটি ঘণ্টা কাহারও পক্ষে অচল কাহারও পক্ষে সচল হইয়া ত চলে না? সে মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে প্রত্যেকেরই আয়ুষ্কাল সমানভাবে চিহ্নিত করিয়া যাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে নন্দ পলে পলে নিজেকে হত্যা করিয়া চলিল।

সংসারে তখন অন্য কোন কষ্ট নাই। একটু দূরে যে ছাড়ের আফিস ছিল তাহার বড় বাবুটি বৃদ্ধ এবং ধর্ম্মভীরু। নন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঠ কাটিবার জন্য কিছু জঙ্গল সুবিধাজনক সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। জমি হইতে কাঠ কাটাইয়া নদীর ধারে সে জড় করিয়া রাখিত। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা আসিয়া মূল্য দিয়া লইয়া যাইত।

এদিকে অবসর সময়ে পিতার সাহায্যে সৌরভি একখানা বড় ও একখানা ছোট ঘর ও সেই সঙ্গে ঢেঁকি ও গোয়াল ঘর প্রস্তুত করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া তকতকে ঝরঝরে করিয়া ফেলিল। সমস্ত বাড়ীটা

ডালপালার দ্বারা পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের গা ঘেঁসিয়া গাঁদাফুলের শ্রেণী। নদী পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও বিস্তৃত রাস্তা। দু'টি দুগ্ধবতী গাভী, কয়েকটা ছাগল, একটি টিয়া পাখী, একটি ময়না।

কিন্তু এত উদ্যোগ আয়োজন করিয়াও পিতাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নন্দ দুর্ভাবনায় দিন দিন শীর্ণ হইয়া অবশেষে একদিন পীড়িত হইয়া পড়িল। সৌরভি চোখে অন্ধকার দেখিল।

নন্দর রোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কখন চেতনা থাকে—কখন থাকে না—এই রকম অবস্থা। পিতার কাপড় চোপড় এবং বিছানার ওয়াড়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিবার জন্য আগের দিন রাত্রে সৌরভি সে সকল ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। তখন বৃষ্টি ছিল না। গাছের পাতার সঞ্চিত জল টিপ্ টিপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। পিতাকে পথ্য দিয়া সিদ্ধ কাপড়ের চুপড়িটি লইয়া সে ঘাটে আসিল। পাটে আছ্ড়াইয়া কাপড়গুলি কাচিয়া শেষ করিয়া সে দম লইতেছে এমন সময় দেখিল একখানা পানসী নৌকা কূল ধরিয়া আসিতেছে। আরও দেখিল, ছাপ্পরের উপর একটি যুবক তাহার উপর দৃষ্টি প্রখর করিয়া রাখিয়াছে। সে চক্ষু নত করিল।

নৌকাখানা কাছে আসিতে যুবকটি জিজ্ঞাসা করিল, "সৌরভি না?"

সৌরভি এক নজর চাহিয়া দেখিল, তাহাদেরই গাঁয়ের জমিদার পুত্র কুমুদরঞ্জন।

কুমুদ বলিল, "হঠাৎ তোমাদের কি হ'ল বল দেখি? কেউ জান্‌লে না—শুন্‌লে না—এখানে কোথায় এসেছ?"

সৌরভি তেমনি মুখ নীচু করিয়া জবাব দিল, "এই জঙ্গলে এসে বাসা বেঁধেছি।"

কুমুদ বলিল, "এত ঠাঁই থাকতে বাঘ-ভালুকের দেশের উপর মায়া হ'ল—হেতু ?"

সৌরভি তেমনি নতমুখে জবাব দিল, "মানুষের দেশকে আরো ভয় হ'ল ব'লে।"

যদিও এ মেয়েটির মুখে এরূপ জবাব এই নূতন নহে, তবুও অনেক-দিনকার অসাক্ষাতের পর এই কথার ভিতরে এত অধিক ভৎর্সনা ছিল যে কুমুদ লজ্জায় কিছুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দ কোথায় ? কেমন আছে ?"

সৌরভি বলিল, "বাড়ীতে। বড্ড অসুখ তাঁর।"

"কি অসুখ!"

"জ্বর, কাশী—বাহিরে ত এগুলি আছে। ভিতরে আরও কত কি—আমি সব জানিনে।"

মাঝিদের নোঙর করিতে বলিয়া কুমুদ নামিয়া পড়িল। বলিল, "কাপড় কাচা হ'যে গেছে তোমার? কোথায় বাসা বেঁধেছ চল, নন্দকে একবার দেখে আসি।"

এত বড় দুঃসময়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ইহার আগেকার আচরণে মনের সঞ্চিত ঘৃণার অবশেষ ছাপাইয়া এই একটুখানি স্নেহের স্পর্শে সৌরভির চোখের পাতাদুটি ভিজিয়া উঠিল।

সে বলিল, "একটু দাঁড়ান্ আপনি—কাপড়গুলো ধুয়ে নি।"

এই বলিয়া সে হাঁটু জলে নামিয়া বস্ত্রগুলি জলের উপর নাড়াচাড়া করিয়া ধুইতে প্রবৃত্ত হইল। কুমুদ তদবসরে পিছন দিক হইতে সেই পুষ্পিত পল্লবিত দেহের রূপযৌবন দুটি চোখে শুষিয়া লইতে লাগিল।

অঙ্গনে পা দিতেই বাড়ীখানার পারিপাট্য দেখিয়া কুমুদ মুগ্ধ হইল। সমস্ত গৃহের রচনা-কুশলতায় চেহারা ফিরাইতে যে দুখানা নিপুণ হস্ত কাজ

করিয়াছে, সে ত ইহার নেপা-পোঁছা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতি অঙ্গে ধরা দিতেছে।

কুমুদ দেখিল, ঘরের বেড়াগুলি মাটির প্রলেপে দেওয়ালের মত করা হইয়াছে। উপরে খড়ের পরিচ্ছন্ন ছাউনি। পাঁচিলও মাটি দিয়া লেপা। দুইদিকে খড়ের ছোট চালা। অঙ্গনটি পরিচ্ছন্ন। পার্শ্বে একদিকে একটা তুলসী গাছ—পিঁড়ি গাথা। চারিধারে গাঁদা ও দুমুখী ফুলের শ্রেণী। ঘরের মধ্যে আলমারী, কুলুঙ্গি, তাক্—সমস্তই মাটির। ঢেঁকি ঘর, রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুমুদ অবাক হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লালসার মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল।

ঘরের ভিতরে নন্দর রোগশয্যার পার্শ্বে সৌরভি তাহাকে বসিতে আসন দিল। নন্দর তখন জ্ঞান ছিল না। কুমুদের কাছে অবস্থাটা ভাল বোধ হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা কিছু কর নি?"

সৌরভি বলিল, "বন বাঁদাড়ে ডাক্তার বদ্দি ত নেই। এখানে জঙ্গলের এক আফিস আছে। কাল গিয়ে বড় বাবুর পা জড়িয়ে ধরি। তিনি পাইক দিয়ে চারক্রোশ দূরের এক ডাক্তারখানা থেকে আট দাগ ওষুধ আনিয়ে দেন। তাই খাওয়াচ্ছি।"

এই বলিয়া ঔষধের শিশিটা সে উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

কুমুদ বলিল, "না দেখে শুনে ঢিল ছুঁড়লে কি রোগের গায়ে লাগে? এখন ত ভাঁটা। জোয়ারের সময় নৌকা ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারকে আমি সঙ্গে ক'রে আনবখন। তুমি কিছু ভেবো না।"

আরও কিছুকাল থাকিয়া সৌরভিকে সাহস সান্ত্বনা দিয়া কুমুদ খাওয়া দাওয়া করিতে নৌকায় চলিয়া গেল।

সৌরভির দেহের উপর যে একটা দুর্ব্বার লোভ কুমুদের অন্তরে দলের

উপর দল মেলিতেছিল, তাহা সুপরিস্ফুট হইল সেদিন—যেদিন দুঃখের ভার মাথায় লইয়া সৌরভি দেশত্যাগী হইল।

অধীর হইয়া কুমুদ চতুর্দ্দিকে খোঁজ করিতে লাগিল। অবশেষে সে এক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর নিকটে খবর পাইল যে, তাহাদের নৌকায় চড়িয়া ইহারা সুন্দরবনের এক গভীর জঙ্গলে নামিয়া পড়িয়াছে। সে একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। শিকারের উপলক্ষ করিয়া একদিন নৌকাযোগে বাহির হইয়া পড়িল। বিশেষ খোঁজ করিতে হইল না, পথ চলিতে চলিতে নদীর ধারেই সাক্ষাৎ মিলিয়া গেল।

কুমুদ সবে মাত্র খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সৌরভি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বালুর চড়ার উপর দাঁড়াইল।

কুমুদ তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া ডাঙায় নামিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সৌরভ?"

সৌরভি বলিল, "আপনি একবার আসুন। বাবা কেমন করছে, দেখবেন।"

তাহারা উভয়ে আসিয়া দেখিল—নন্দর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

সৌরভি 'বাবা!' 'বাবা!' বলিয়া কিছুক্ষণ সেই মৃতদেহের উপরে বিলুণ্ঠিত হইল, তারপর স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল।

হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া পিতার রক্তলেশহীন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইতেই তাহার চক্ষু দুটি হইতে পুনর্ব্বার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কুমুদ কি সান্ত্বনা দিবে বুঝিয়া পাইল না। নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

সৌরভি কিন্তু উঠিয়া গেল। যে ওয়াড়গুলি সে কাচিয়া কুচিয়া

শুকাইতে দিয়াছিল তাহা আনিয়া তোষক ও বালিসে পরাইল, এবং একটা মাদুর টানিয়া লইয়া পরিচ্ছন্ন শয্যা রচনা করিল। ইচ্ছা—পিতাকে তাহাতে শয়ন করাইয়া শ্মশানে লইয়া যায়। কিন্তু তাহারা জাতিতে ডোম—কুমুদ ব্রাহ্মণ, সে কি মৃতদেহ স্পর্শ করিবে।

তাহার চঞ্চলভাব লক্ষ্য করিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইয়া নন্দর প্রাণশূন্য দেহ স্পর্শ করিল এবং সৌরভির রচিত শয্যার উপর শবদেহ তুলিয়া লইয়া হাত-পাগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া দিতে লাগিল।

সৌরভি আর কোন প্রশ্ন করিল না। অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা দুই হাতে টানিয়া লইয়া কুমুদকে সে নমস্কার করিল।

৫

কুমুদ সেই অবধি বাড়ী যায় নাই। নৌকায় রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়, আর সৌরভির তত্ত্ব তল্লাস লয়। কাল সে বলিতেছিল,—নৌকা সে ছাড়িয়া দিয়াছে, নদীর পরপারে একটা বাসা লইয়া সে অবস্থিতি করিতেছে। ইহারই বা সুদীর্ঘকাল ঘর-দ্বার ছাড়িয়া পড়িয়া থাকিবার হেতু কি? অযাচিত দয়ার দ্বারা এই যে একান্ত অহেতুক লীলা না জানি সতর্কতার মাঝখানেও ইহার পরিসমাপ্তিটা কি আকারে ঘটিবে? উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সৌরভির অন্তরটি পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

একদিন সকালবেলা নন্দর সুবৃহৎ কুঠারখানা হাতে লইয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া সৌরভি কাঠ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দূর হইতে কুমুদকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পানের বাটা লইয়া বসিল।

কুমুদ ঘরে ঢুকিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। আশ্চর্য্য হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত ঘেমেছ, কেন?"

সৌরভি মুখ নীচু করিয়া উত্তর করিল, "কাঠ কাট্‌ছিলাম।"

"কাঠ কাট্‌তে এত ঘেমে গেলে? রান্নার কাঠ নেই বুঝি? সে ত শুক্‌নো ডালপালা কুড়িয়ে নিলেও চলে। আমাকে বলনি কেন? যোগাড় ক'রে দিয়ে যেতুম।"

জমিদার পুত্র সে। এতটা অনুগ্রহ একটা অস্পৃশ্য ডোমের মেয়ের জন্য সৌরভির ভাল ঠেকিল না। মনের ভিতর যেন খচ্ খচ্ করিয়া স্থচ বিঁধিতে লাগিল। তথাপি সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "জ্বালানি কাঠ নয়।"

"তবে?"

"বাবা যে মহাজনদের কাঠ দিত, তারা কাল এসেছিল। যতটা পারি কেটেকুটে দিতে হবে তাদের।"

কুমুদ ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কতটা আর পার তুমি? ঐ সব মোটা মোটা কাঠ নিজের হাতে কেটে ব্যবসা চালান কি তোমার কাজ?"

সৌরভি কহিল, "যা পারি, একটা পেট চ'লে যাবে।"

কুমুদ থপ্ করিয়া বলিয়া বসিল, "কিন্তু আমি তা' চলতে দেব না সৌরভ?"

মন্ত্র পড়িয়া কে যেন বাণ ছুঁড়িল। সৌরভির সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া মুখখানা নীচু হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

এই একটি কথার প্রশ্নের কুমুদ হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। সে বিহ্বলভাবে সৌরভির দিকে তাকাইয়া রহিল।

অধীরভাবে সৌরভি বলিল, "বলুন না, কেন?"

শঙ্কাকুল-চিত্তে জড়সড় হইয়া কুমুদ কহিল, "অনেক দিনই বলেছি সৌরভ! এমন অনেক কথা আছে, যা' কেবল চোখ দিয়েই লোকে বলে আর শোনে।"

যে কথার আভাস সে মুখ দিয়া প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিল, তাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত না হইলেও ইহার পশ্চাতে আশঙ্কার তীক্ষ্ণ কাঁটা ঘর দ্বার এবং চলা-ফেরার পথটিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়া আছে সৌরভ তাহা দেখিতে পাইল। দুর্দ্দিনের সুযোগে অস্পৃশ্য লোকের মৃত দেহ ছোঁয়া, সৎকার করা—দুর্ব্বলা নারীর শ্রমের কুঠার চাপিয়া ধরা, কথায় কথায় সৌরভির দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করা—সমস্ত সহৃদয়তার আবরণ খসিয়া গিয়া অভিসন্ধির মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

পানের বাটাটা দূরে ঠেলা মারিয়া ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। "ওঃ! এত বড় লোভ!" এই বলিয়া খুঁট গুঁজিতে গুঁজিতে ক্রুদ্ধ সর্পের মত ঘাড় বাঁকাইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

কুমুদ বিমর্ষ বিরস মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে সে আবার আসিল। একান্ত নিরাশ্রয় সৌরভি—এই ভাবিয়া এই পাঁচ দিনে বোধ করি তাহার অন্তরে কিছু সাহসের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। সৌরভিও এই সময়ের মধ্যে নিজকে কতকটা শান্ত করিয়া লইল।

কুমুদকে অঙ্গনে দেখিয়া সে ঘর হইতে একখানা আসন দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আড়ালে থাকিয়াই সে বলিতে লাগিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। চোখ দিয়ে কথা বলার যে কথা সেদিন বল্‌ছিলেন সে কি ভাষা? সে কি সর্ব্বত্রই চলে? না, শুধু এই ডোমের মেয়ের কাছেই চলে? সে দিন সে ভাষায় ত মনের কথা কতকটা ব'লে গেছলেন, আজ আবার কি বল্‌তে এসেছেন?"

মানুষ যখন নিম্নগামী হয় তখন তাহার অপমান পরিপাক করিবার শক্তিও বাড়িয়া যায়, তাই কুমুদ নির্লজ্জের মত সেই অনাদরের আসনখানার

উপরই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি ত নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছ। তোমার একটুখানি সুখ সুবিধে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সৌরভি বলিল, "সে দেখ্‌বার কোন অধিকারই ত নেই আপনার। এতদিন যা দেখেছিলেন সেটুকু পাওয়াও আমার উচিত হয় নি। তখন ত জানি নি, দেবতার খোলসে দানব ব'সে রয়েছে! সে জান্‌লে বাবার সৎকারের সময়ের সাহায্যটুকুও আমি নিতাম না।"

সৌরভির চক্ষু দুটি দিয়া যে নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ হইতেছে কুমুদ তাহা দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ জড়পিণ্ডের মত বসিয়া থাকিয়া একটা কিছু শেষ করিবার অভিপ্রায়ে প্রবল উত্তেজনা বশে হঠাৎ সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ডাকিল, "সৌরভ!"

সৌরভির কান জ্বালা করিয়া উঠিল। সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিস্ময়ে ও লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া কুমুদ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর সে বহুদিন আর আসিল না। সৌরভিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু এই অশান্তির যবনিকাপাত এইখানেই হইল না। বাড়ী ঘর ঘুরিয়া কিছুকাল পরে কুমুদ হঠাৎ আবার একদিন ধূমকেতুর মত আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌরভি তাহাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ও কবাট বন্ধ করিল।

কুমুদ বলিল, "মানুষ দেখে—সে যে রকমেরই হোক্, কবাট বন্ধ করা উচিত হয় না সৌরভ?"

সৌরভি ঘরের মধ্য হইতে জবাব দিল, "খুবই অনুচিত। কিন্তু সে দিনকার ব্যবহারে প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে, আপনার সাহস আছে—আর—

আমারও সাবধান হবার দরকার আছে।” কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, “কিন্তু এই কবাটটাই দুজনার মধ্যে বেড়া দেবার প্রধান অস্ত্র করেছি— ততটা দুর্ব্বল আমি নই। আমি ত আমার কবাটের বল জানি, তার চেয়ে আপনার লাথির জোর বেশী।” এই বলিয়া সে দরজা খুলিয়া, বাহির হইয়া আসিল ; বলিল, “আপনার সবটুকু বলের পরীক্ষা আজ শেষ ক'রে ফেলুন। আপনার সঙ্গে অকারণ কথা কাটাকাটি করতে আর আমি পারি নে !”

তার চক্ষু দুটি তখন স্থির—অচঞ্চল—কিন্তু জল ঝরিতেছে। ইহার প্রতি বিন্দুটির কি ভয়ঙ্কর শক্তি ! কুমুদ চোখে অন্ধকার দেখিল। সেদিন কথার কোনো শেষ হইল না—কুমুদ চলিয়া গেল।

ইহার পর সে প্রতিদিনই আসিতে লাগিল, কিন্তু কথার সুর বদ্‌লাইয়া ফেলিল। দেশ ভুঁই বাড়ী-ঘর থাকিতে এই বন-বাঁদাড়ে একলাটি পড়িয়া থাকা সৌরভির কোন মতেই কর্ত্তব্য হয় না, এই রকমে দেশে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

এই হিতৈষণার মূলগত কারণ বিশেষ দুর্ব্বোধ্য না হইলেও কি ভাবিয়া একদিন সৌরভি সহসা রাজী হইল। বলিল, “আচ্ছা ! কিন্তু এক নৌকায় ?”

কুমুদ বলিল, “নৌকোর ত অভাব হয় নি। যদি বল, দু'খানাই করা যেতে পারে।”

সৌরভি বলিল, “আপনি জমিদার লোক, ভাড়াটা হয়ত নিজেই দিতে চাইবেন। কিন্তু সে অল্প-সল্প টাকা আমারও আছে।”

তারপর গরু দুটি বিক্রয় করিয়া স্বতন্ত্র নৌকায় কুমুদের নৌকার পাশাপাশি হইয়া সে দেশে চলিয়া আসিল।

সে নিজের বাড়ীতে যাইয়াই উঠিল, কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত হইল না।

এখানে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে কিনা বুঝিয়া দেখিতে সে আর তিলার্দ্ধ শৈথিল্য করিল না। পরদিন প্রভাতেই কুমুদদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদ তখন রকের উপর বসিয়া হাত মুখ ধুইতেছিল। কঙ্কাবতী পুত্রের নিকটে শিকারের গল্প শুনিতেছিলেন। সৌরভিকে দেখিয়া তাঁহার চোখের পলক থামিয়া গেল। বলিলেন, "সৌরভি যে! কোথায় ছিলি এতদিন? কখন এলি?"

সৌরভি হাসিমুখে কহিল, "আপনার ছেলের সঙ্গেইত এলাম ঠাকুরমা!"

কঙ্কাবতী পুত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। কুমুদের মুখখানা ভারি হইয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কঙ্কাবতী রোষদীপ্ত কটাক্ষে বলিলেন, "তুই বললি না কুমুদ, শিকারে গিয়েছিলি?"

ইহার উত্তর সৌরভিই দিল। বলিল, 'শিকার উনি অনেক রকমের করেন। পুকুর ঘাটে মাছও ধরেন, আবার, সোঁদর বনে বাঘও মারেন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "পাছে আপনার কচি ছেলেটির মাথা চিবিয়ে খাই, সেই ভয়ে আমি নিজেই ত উদ্‌যুগী হ'য়ে জঙ্গলে চ'লে গেলাম। কিন্তু আপনি কি ক'রে আমার মাথাটা চিবুতে সেই ছেলেকে জঙ্গল পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে পাঠালেন?"

সৌরভির মনে যে কথা উঠে—তাহা যত রূঢ়ই হউক না কেন, বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিলে সে যেন খালাস পায়। কঙ্কাবতীর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখ এবং কুমুদের অগ্নিবর্ষী চক্ষু দেখিয়াও সে হটিল না। বলিল, "কিন্তু আপনার ভয়ের কারণ নেই। অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে ভালয় ভালয় আপনার ছেলেটিকে, ফিরিয়ে এনেছি—তার মাথা চিবিয়ে

খাইনি ; কিন্তু তিনি যাতে আমার মাথা চিবিয়ে না খান তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হ'বে ঠাকুরমা !"

কঙ্কাবতীর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, ক্রোধে অধর দংশন করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

সৌরভি কহিল, "সমাজ হিসাবে আপনি আমার একজাতি না হ'লেও মেয়ে হিসাবে আমরা একজাতি। তাই আপনার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করতে এসেছি। আপনি যদি নিজের ছেলেকে না সামলান, তা হ'লে আমিও পরের ছেলেকে আর সামলাব না, এই আপনাকে ব'লে গেলুম।" বলিয়া আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সৌরভি দৃঢ়পদে প্রস্থান করিল।

ভূতির মা'র মহাষ্টমী

১

"ও ভূতি—ভূতি, মিন্‌ষে আজ সূয্যির মুখ দেখবে না, না কি? ঘোষেদের বাড়ীর ঢাকের বাদ্যি কানে যায় না?"

"বাবা ত উঠেছে।"

"বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছে বুঝি? থেলো হুঁকোটা ভেঙে ফেলে দিতে পারিস? আজ মহাষ্টমী, সে হুঁসও নেই? দাঁতে গুড় দিয়ে প'ড়ে রয়েছে—জমীদারী থেকে ভারে ভারে জিনিষ-পত্তর আসবে বোধ করি?"

গৃহিণীর এ প্রকার সাদর সম্ভাষণ নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে দিন মহাষ্টমীর সকাল-বেলাটায় চোখে-মুখে জল না দিতেই কালীতারার ওষ্ঠাধরের তাচ্ছীল্যভরা তাণ্ডব-নৃত্যে চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মণ্যগৌরব যেন অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িল।

যাহা হউক, নীলকণ্ঠের একটা বড় গুণ ছিল। শিরার উষ্ণ শোণিতের খরগতি অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে তিনি শান্ত করিতে পারিতেন। এ জন্য তিনি নিজকে মনে মনে শিবতুল্য মানুষ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু কালীতারার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেন। "যে নারী স্বামিগর্ব্বে গর্ব্বিতা হয় না, তাহার জীবনই যে বৃথা! জমিদারী ত নেই-ই। সে থাকলে কপালে ফোঁটা কাটি? আর যা করি না করি, বৈধ-অবৈধ যে কোন উপায়ে দু বেলা খাবারের সংস্থানটা মন্দ কি করি? শুধু হাতে যে রকম তালি বাজিয়ে চলেছি—কত জমী-দারের তিন পুরুষের মাথা একত্র হ'তে দেখলাম—কেবল ঘুঁটের বোঝা—

সার নেই—বুদ্ধির বেলা অষ্টরম্ভা! গিন্নীর সুবিচার থাকলে স্বামীর দারিদ্র্য সম্বন্ধে যাই বলুন, বুদ্ধির তারিপ অবশ্যই তিনি করতেন।" মনের আবেগে এমনই কত কি নীলকণ্ঠ ভাবিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আবার চিন্তার ধারার অভ্যস্ত পথে ফিরিয়া আসিলেন। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিলেন,—"দূর ছাই! দশ হাত কাপড়ের কাছাখোলা বুদ্ধি!—বুদ্ধি নাই বলিয়াই দুর্ব্বুদ্ধিতে চেপে ধরে—স্বামিলোকের এ সকল চোখ-কান বুজে সহ্য করাই উচিত।"

নীলকণ্ঠ হুঁকার জলটা পাল্‌টাইয়া লইলেন, এবং আগুনের মালসার কাছে পুনর্ব্বার বসিয়া কলিকাটি ঢালিয়া ফেলিয়া বাঁশের চোঙ্গা হইতে এক ছিলিম তামাক লইয়া টিপিয়া-টিপিয়া সাজিতে লাগিলেন। সম্মুখে একখানা লোহার চিমটা। একটা সরায় তামাকের গুল স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল। গুলগুলি গণিলে রাত্রিবেলা কতবার তাঁহার হুঁকার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ধরিতে পারা যায়।

কালীতারা উঠান ঝাঁট দিতেছিল। চক্ষু দুইটি ক্রোধে জ্বলিতেছে—কিন্তু কান দুইটি নীলকণ্ঠের ঘরের দিকে খাড়া ছিল।

হুঁকার ভড়াৎ-ভড়াৎ শব্দ কিছুক্ষণ শুনা যাইতেছে না; মিন্‌ষে কি তবে গাড়ু লইয়া বাহিরে গেল? নিরাকার পরম ব্রহ্ম হইলে সম্ভব হইত বটে। বারান্দার দ্বার ত একটা—চোখে ধূলি দিয়ে যাবে কোন্ পথে?—সে সন্দিগ্ধ হইয়া মেয়েকে ডাকিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"ভূতি, মিন্‌ষে কি হুঁকোয় জল পাল্‌টালে না কি? দড়ি জোটে না?"

মিন্‌ষে ততক্ষণে এক খণ্ড ঘুঁটের আগুন সাজা তামাকের উপর চিমটা দিয়া গুঁড়া করিয়া ফুঁ পাড়িতেছিলেন।

নীলকণ্ঠের তখন ভাবাবস্থা, প্রাণের আবেগে চক্ষু দুইটি বুজিয়া

গিয়াছে। ঘোষের বাড়ীর দশভুজার প্রতিমূর্ত্তি তখন তাঁহার অন্তরে জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন,—"বাঘ-মহিষের ঘাড়ে চেপে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এই সকল সাংঘাতিক অস্ত্র যিনি হাতে ধরেছেন, তাঁর মনটাও সেই রকম উগ্র হওয়াই সম্ভব; অথচ লোক তাঁর পদতলে শির অবনত করছে; আর আমি গৃহিণীর ক্ষুর-ধার জিহ্বার নিকটে একটু নত হয়ে থাকতে পারি না?" ঠিক এমনই সময়েই গলায় দড়ি জোটাইবার কালীতারার ইঙ্গিতবাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। নীলকণ্ঠ হাই তুলিয়া—তিনটি তুড়ি দিয়া—'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিয়া গেলেন, এবং বড় বড় দম লইয়া গৃহিণীর দ্বিতীয় বারের বাক্যজ্বালা কুণ্ডলীকৃত ধূমের সহিত ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

এইরূপে কলিকাটি নিঃশেষ হইলে তিনি গাড়ু লইয়া উঠানে নামিয়া, কালীতারা ঝাঁট দিতে দিতে জঞ্জালের স্তূপ লইয়া উঠানের যে কোণটায় স্থিত হইয়াছিলেন, তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। থক্—থক্ করিয়া কয়েকবার কণ্ঠটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া তিনি বলিলেন,—"কালী, অতি সঙ্গত প্রস্তাবই তুমি করেছ। কিন্তু গত সন কোষ্ঠার দর ছিল চব্বিশ টাকা—এবার সস্তা।"

একটু ভাবিয়া আবার নীলকণ্ঠ কহিলেন,—"দড়িটা সহসা জোটাব —একটু সময় দিতে হবে, কালী! তোমার মাছের আপশোষটা মিটিয়ে দেই। নেদোকে দিয়ে কি কি মাছ ভালবাস, বরঞ্চ একটা ফর্দ্দ ক'রে রেখে দিও।"

কালীতারা দাঁত সিটকাইয়া বিকট দৃষ্টিতে এক বার স্বামীর দিকে চাহিল। বলিল,—"ওঃ! কি ভাগ্যবন্ত পুরুষ! সোনাদানা না দিক, দু'বেলা দু'মুঠো পেট পুরে খেতে দিতে পারে না—তার আবার কথার বড়াই দেখ? সারাটা জীবন চোখ বুজেই কাটালে! ছিঃ! ছিঃ! একটু হায়া নেই!"

নীলকণ্ঠ গাড়ুটা মাটীতে রাখিয়া এক টিপ নস্য লইলেন। বলিলেন,—"ছোট জেতের ডুবুরীরা সোনা পায়—নীলকণ্ঠ চক্কোত্তি চেষ্টা করলে পায় না—এ অসম্ভব। কি জান?—সোনায় চোরের উপদ্রব বাড়ে। আর দানা,"—নীলকণ্ঠ হাসিলেন। বলিলেন,—"তা দিতে পারা যায়। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের যে হিড়িক, দানা খেতে দেখলে কে কোন্ দিন প্রয়োজনে গালে লাগাম দিয়ে আমাকে ভাগ্যহীন ক'রে বসবে। চোখ বুজে কাটালাম, এ কথাটা সত্য বলনি কালী! চোখ বুজতে ত ইচ্ছা হয়—তোমার মায়ায় পেরে উঠিনে।"

কালীতারার হাঁড়িপানা মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন "ভাগ্যটা আমার নেহাৎ মন্দই বা কি! কথায় আছে, স্ত্রীর ভাগ্যে ধন—পুরুষের ভাগ্যে জন।' পাঁচ-পাঁচটি রত্ন কোলে ধরেছ, মেয়েও হয়েছে তিনটি—আবার একটি আসছেন। ধনের ভাগ্যটা ত আমার নয়।"

জঞ্জালে চুপড়ি বোঝাই করিয়া কালীতারা তাহা কাঁখে লইল। বলিল, "মা গো, পর্ব্বের দিন প্রাতঃকালে গায়ে প'ড়ে কি ঝগড়া এ? গাড়ু নিয়ে কোথায় যাচ্ছ—যাও না? আমার ভাগ্যের গুণে ওঁর হাতে-পায়ে পক্ষাঘাত হয়েছে—ওরে আমার মরদ রে!"

জঞ্জালের চুপড়ি লইয়া কালীতারা গৃহের পশ্চাদ্ভাগে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠও গাড়ু লইয়া বাহিরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া ভিজা গামছার দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করিতে করিতে দেহের এক পর্দ্দা চামড়াই বুঝি তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। ভূতিকে বলিলেন, "চন্দন ঘষেছিস—দে। নামাবলী?"

ভূতি চন্দনের বাটি ও নামাবলী আনিয়া দিল। বলিল, "বাবা, আজ অষ্টমীর উপোস।"

নীলকণ্ঠ আয়না ধরিয়া ফোঁটা কাটিতে কাটিতে বলিলেন, "তাতে আপশোষ নেই। চিঁড়ে চাপাটি ঘরে আছে?"

ভূতি কহিল, "মা বল্‌ছিল, চিড়ে না, ময়দা গুলে খাবে। নারকেলও ঘরে নেই।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "গুড়ও নেই—দুধও নেই—কলাও নেই। স্বচ্ছলতার মধ্যে একটা হাঁড়ির বৃদ্ধি হয়েছে, তুই চোখ না মুছতেই চোখে প'ড়ে গেছে। বামুনের ছেলে—অষ্টমীর খবরটা অবশ্যই রাখি। পয়সা যে বাতাসের তালে তালে ওড়ে; গরীবের হাতে কি সহসা ধরা দেয়?" একটু থামিয়া বলিলেন, "দেখি, পক্ষাঘাতের হাত-পায়ের জোরে কত দূর কি হয়। তোমার মা বোঝেন সব—অথচ তলিয়ে বোঝেন না। পক্ষাঘাতের খোঁটা দিলেন—পুরুষকারটা আমিও মানি—তা'তে আর কতটা এগোয়? পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে ঘরদশেক যজমান—তাও গ্রামের বাইরে। তাতে কি পেট-কাপড় চলে? তোমার বাবা তুড়ি দিয়ে তোমাদের রুচিমত খাদ্য দু'বেলা যা জোটাচ্ছে, পাড়ার কোন্ বেটা তা' পেরেছে? অথচ তোমার মা'র দাঁতখিচুনী যায় না। দে—লাঠিখানা দে।"

শিখাটি দশ অঙ্গুলির দ্বারা টানিয়া টানিয়া পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া ভুঁড়িটার উপর নামাবলী দোলাইয়া কাল গণেশটির মত নীলকণ্ঠ পথে বাহির হইলেন।

২

নীলকণ্ঠের হাতে—গেঁটে পয়সার সংস্রব যত থাকুক না থাকুক, শুধু বাকচাতুর্য্যের দ্বারাই অতি বড় শত্রুর নিকট হইতেও ছোঁ দিয়া অন্ততঃ তিনি কুটাগাছটি লইতে পারিতেন। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য অভাব-অভিযোগের মধ্যেও তাঁহার মুখখানা কখনও অন্ধকার দেখা যাইত না। লোকও তাঁহার চাতুরী বড় একটা ধরিতে পারিত না। তিনি হাসিতে হাসিতে দশ ঝুড়ি মিথ্যা বলিয়া যাইতেন, হাসিতে হাসিতে লোকের চিত্ত বর্ষার বেগবতী নদীর মত নিজের দিকে ফিরাইয়া লইতে

পারিতেন এবং শুধু কথার ছন্দ ও সৌন্দর্য্যের বিনিময়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লোককে অব্যাহতি দিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোন দিন সঙ্কোচ ছিল না। রাজা প্রজা সংসারে ধাপ্পাবাজ কে নহে? স্বার্থের সংঘর্ষ লইয়াই ত সংসার। রাজা-রাজড়ার আজ্ঞামাত্রই যদি আইন আর বিধি হইতে পারে, দরিদ্রের পেট চালাইবার কৌশল বা উপহসিত হইবে কেন? ইহাই ছিল নীলকণ্ঠের অন্তরের ভাব—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের চিরন্তন রূপ।

রামপ্রসাদের একটা মাতৃনাম মনে মনে ভাঁজিতে ভাঁজিতে নীলকণ্ঠ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে গোলোক বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। গোলোক জিজ্ঞাসা করিল, "সকাল সকাল সাজ-সজ্জা ক'রে কোথায় চলেছ, নীলুদা?"

নীলকণ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, "সাজ-সজ্জা আর কি? নামাবলীটা—ওটা সুব্রাহ্মণের লক্ষণ। আচ্ছা, ভায়া! পৃথিবীর মানচিত্রের পরিবর্ত্তন ত অনুক্ষণ ঘটছে। আজ যেটা জার্ম্মাণীর দখলে—কা'ল সেটা ফরাসীর; আজ ইতালীর, কা'ল আমেরিকার; আজ চীনের, কা'ল জাপানের। তোমার নীলুদার অধিকারে কি এক ছটাকও আসতে নেই?"

গোলোক হাসিল। বলিল "গায়ে নামাবলী থাকতে সে সুবিধে হবে না, নীলুদা! ওটা ত্যাগ কর। আর ফোঁটাটার পরিবর্ত্তন কর, হয় ত্রিনয়ন, নয় ত ত্রিশূল-চিহ্ন। স্থানমাহাত্ম্যে হয় ত এ দুটিতে শক্তির সঞ্চার হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন কমণ্ডলু হাতে ক'র না। তা হ'লে ঐ দুটিই আবার শুধু বেঁচে থাকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়াবে। সকাল সকাল চলেছ কোথায়?"

নীলকণ্ঠ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তুমি, আমি, সবাই ত এক পথে চলেছি, নূতন খবর তোমাকে কি দেব? কেনা আর বেচা এই নিয়েই

ত সংসারের লোক মসগুল। কেহ পাপ কেনে, পুণ্য বেচে ; কেহ পুণ্য কেনে, পাপ বেচে। লোক যখন ব'সে কাটায়, তখনও ত মনে মনে ঐ দু'টা কায করে। এ ছাড়া ত দ্বিতীয় একটা কায নেই যে, তোমাকে সেই পরিচয় দেব ?

গোলোক বলিল, "অতটা বুঝে দেখিনি। সোজা কথায় শুন্তে চেয়েছিলুম, যদি বাধা থাকে ত থাক।"

নীলকণ্ঠ এক টিপ নস্য নাকে দিয়া বলিলেন, "হুঁ, আজ মহাষ্টমী, জান না ? গৃহিণীর উপবাস, নীলুদার মহাত্রাস। বালককালে ভাবতাম, পঞ্জিকায় উপবাসের সংখ্যাটা যত বেশী লেখে, তত ভাল ; আমাদের গরীব লোকের সাঁঝের চালটা বেঁচে গেলে মন্দ কি ! কিন্তু এমন উঁচুদরের উপবাস, তা ত সে সময় জানিনি। চিড়ের সঙ্গে দই—দইর সঙ্গে কলা ; ময়দার সঙ্গে দুগ্ধ—দুগ্ধের সঙ্গে শর্করা। এক এক থাঁয়ে বিংশ উপকরণ। চালের চারটি পয়সা বাঁচাতে চার যোলং চৌষট্টি পয়সা ব্যয়। গুপ্ত প্রেসের এ গুপ্ত রহস্য বুঝে, কার সাধ্য ?"

গোলোক হাসিয়া কহিল, "তা আর কি করবেন, দিদির ত আবার ছেলেপিলে হবে খবর পেয়েছিলুম। এ সময় জিভটা সচল হয়, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। যান, একটু ভালমত যোগাড়যন্তর ক'রে দেন যেয়ে।"

এই বলিয়া গোলোক বন্ধু নীলকণ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, নীলকণ্ঠ আবার তাহাকে ডাকিয়া থামাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদু বিশ্বাসের বিধবা মেয়েটার গুটিকযেক গাই ছিল। অনেক দিন সে পথে যাইনি। খবর-টবর রাখ কিছু ?"

গোলোক বলিল, "কেন, গাই কিনবেন, না দুধের দরকার ? তা অত দূর যাবেন ? সে ত প্রায় এক ক্রোশের পথ।"

"না যেয়ে কি করব বল; ঢাকের বাদ্যি শুনছ না? গাঁয়ে কি আর দুধ মিলানর জো আছে? সেখানে গেলে পেতে পারব বল্‌তে পার?"

গোলোক বলিল, "গাই তার আছে, দুধও বেশ হয়, সকাল সকাল যান—বেচে ফেলে না দেয়।"

ঘোষেদের প্রয়োজনে গাঁয়ের দুগ্ধ একেবারে অমিল হয় নাই। রিক্ত হস্তের সন্ধানটা নূতন স্থানে অকাট্য হইতে পারিবে, এই প্রত্যাশায় নীলকণ্ঠ খুঁজিয়া পাতিয়া যদু বিশ্বাসের মেয়ে মাতঙ্গিনীকে বাহির করিয়াছিলেন।

মাতঙ্গিনী তখন স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে গামছার দ্বারা চুল ঝাড়িতেছিল, এমন সময় নীলকণ্ঠ তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া বলিলেন, "মাতু, ভাল আছ ত? গরীবের দ্বারের দিকে যে আর পা মাড়াও না! মাঝে মাঝে না দেখলে প্রাণের উৎসাহ নিভে যায়। এলে গেলে একটা হৃদ্যতা থাকে। আমিও দু'একবার এসে পায়ের ধূলো দেই। না, কলিকালে বামুনের পায়ের ধূলোয় ঝাঁজ নেই?"

মাতঙ্গিনী জিভ কাটিল। তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি আঁচলে মুছিয়া দাবায় পাতিয়া বসিতে দিল। বলিল, "অমন অকল্যেণের কথা বলেন? আমার আর কল্যেণ কি, তা নয়। কিন্তু মজুরদারী জেতের পরকালের ভরসাই ত আপনাদের পায়ের ধূলো।"

মাতঙ্গিনী গলবস্ত্রে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনি বসুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

সে ঘরে ঢুকিলে নীলকণ্ঠ গোয়ালঘরের দিকে দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গাই কয়টি বাঁধা আছে এবং দুগ্ধের ভারে পালান ফাটিয়া পড়িতেছে। নীলকণ্ঠের মনে ভরসা হইল। তিনি মানসদৃষ্টিতে পালানের মধ্যে দুগ্ধের সাকার রূপ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। দাবার

উপর সুমার্জ্জিত বাসনকোসনগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তাহার একটি বড় ঘটীর দিকে দৃষ্টি দিয়া ভাবিলেন, "ঐ ঘটীটা যদি ভর্ত্তি করিয়া দেয়, গৃহিণীর উদর ছাপাইয়া ছেলেপুলে পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে। সকলই ভগবানের লীলা!"

মাতঙ্গিনী কাপড় ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ দিকে কায ছিল বুঝি?"

"হাঁ, একটু কায ছিল। সেটুকু সেরে যাবার বেলায় ভাবলুম, একবার মাতুর খবরটা নিয়ে যাই। কা'ল রাত্রিতে একটা অতি বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছিলাম কি না!"

মাতঙ্গিনী উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বপ্ন—কি স্বপ্ন?"

নীলকণ্ঠ কখন চক্ষু বুজিয়া, কখন বা খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, মাতু, সে অতি অদ্ভুত স্বপ্ন। আজ কতদিন তোমার দেখা-সাক্ষাৎ নাই, জান ত! বোধ করি ছ'মাসের উপর হবে। কি বল? সেই ত ফাগুন মাসে একবার কচি আম নিতে তোমার বাড়ী এসেছিলাম।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "হাঁ, তার পর আপনি আর আসেন নি। দূরের পথ, একলা মানুষ, আমিও আর যেতে পারিনি।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "কি বিচিত্র স্বপ্ন! এত কাল দেখাসাক্ষাৎ নাই—অথচ তোমাকেই স্বপ্ন দেখা—আশ্চর্য্য নয় কি?"

মাতঙ্গিনী পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে স্বপ্ন দেখলেন? কি দেখলেন, বলুন ত?"

"বলব বলেই ত এই পথে এলাম। গৃহিণী আসন্নপ্রসবা, শোননি বোধ করি? তাঁর আজকাল ছেলেপুলে হবে। স্বপ্ন দেখলাম, তুমি সকাল সকাল চান ক'রে, গিন্নীর মহাষ্টমীর পারণের জন্য বড় এক ঘটী

দুধ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হয়েছ। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, তোমার কথা মনেও নেই, অথচ এত লোক থাকতে মহাষ্টমীর দিন তুমিই কাছে এগিয়ে গেলে, কি আশ্চর্য্য!" একটু থামিয়া বলিলেন, "যাই বল, মাতু, স্বপ্ন আমি আদৌ বিশ্বাস করিনে। কত দিন কত স্বপ্নই দেখলাম, একটাও ত সত্য হ'ল না। কিন্তু এসেই তোমাকে চান করা দেখতে পেলুম, স্বপ্নের একটা অংশ কিন্তু ফ'লে গেছে।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, "আপনি একটু বসুন, গাই ক'টা দুয়ে আনি, বাকীটাও ফ'লে যাক্।"

নীলকণ্ঠ ঘোরতর আপত্তিসূচক মাথানাড়া দিয়া বলিলেন, 'না না, মাতু, অমন কায ক'র না। এই পথে যেতে যেতে তোমার বাড়ীটা দেখেই মনে প'ড়ে গেল। তাই কৌতূহল হ'ল, মাতুকে একবার দেখেই যাই না কেন? এখন ঢূঁ মেরে সে বিশ্বাস আমার মাথায় পূরে দেবে বুঝি? কা'ল যদি স্বপ্ন দেখি, আমাদের বাগানে গাছের গোড়ায় টাকা পোতা আছে, তোমাদের এই চমৎকারে হয় ত সমস্ত বাগানটাই আমাকে খুঁড়তে হবে। অত সময়ও আমার নেই, শক্তিও নেই।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, "বাগান খুঁড়ে টাকা না পান, লোকসান হবে না। খোঁড়া জমিতে যে বীজটা ছড়াবেন, আয়পয় দেবে। আপনি একটু বসুন না, আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি।" এই বলিয়া সে একটা বাল্‌তি হাতে করিয়া গোয়ালঘরে প্রবেশ করিল।

মাতঙ্গিনী গো-দোহন করিতে লাগিল, আর নীলকণ্ঠ মুগ্ধ চিত্তে বাঁটের ধারার শব্দ শুনিতে লাগিলেন। যখন টগবগ করিয়া শব্দ বেশ জোরে জোরে পড়িতে লাগিল, তখন ভাবিতে লাগিলেন, "বালতিটা পূর্ণই হ'ল দেখ্‌ছি, আমাকে বা বড় ঘটীটা পূর্ণ ক'রে না দেবে কেন?"

মাতঙ্গিনী সত্য সত্যই বড় ঘটীটা পূর্ণ করিয়া দিল। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "ভাল কায করলে না, মাতু! স্বপ্নের উপর প্রত্যয় জন্মিয়ে দিলে, এখন আমাকে এর পিছু পিছু ঘুরতে হবে।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, "স্বপ্ন ব্যর্থ হ'লে আমাকে গালি পেড়ে ঠাণ্ডা হবেন।"

নীলকণ্ঠ হাসিয়া দুই পাটি দাঁত মেলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "গালিটা কিন্তু আঁধারে পাড়ব না। তোমার এখানে এসে সাম্‌না সাম্‌নি পেড়ে যাব। আর যদি স্বপ্নটা সত্যই হয়, অর্দ্ধেক বখরা তোমার।"

মাতঙ্গিনী কহিল, "আর যদি টাকা স্বপ্ন না দেখে দেখেন যে, সাঁড়া গাছ থেকে একটা পেত্নী নেমে এসে আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছে?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "তা হ'লেও অর্দ্ধেক বখরা তোমার। একটা ঘাড় ত খালাস পাবে। সুখের সাথী—দুঃখের সাথী হবে না কেন? যাক্, এ সম্বন্ধে আর এক দিন কথা বল্‌ব। আজ তবে উঠি, একা মানুষ, কত কি কায প'ড়ে রয়েছে।"

এই বলিয়া নীলকণ্ঠ দুগ্ধের ঘটীটা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাতঙ্গিনী আর একবার পদধূলি লইল।

পথ চলিতে চলিতে বাঁকা পথে নীলকণ্ঠ একটু ঘুরিয়া চলিলেন এবং রাম সরকারের বাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম দাবায বসিয়া কোষ্ঠা কাটিতেছিল। নীলকণ্ঠের দিকে নজর পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল, "অনেক দুধ সংগ্রহ করেছ দেখি, বাবাঠাকুর! কত ক'রে সের নিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "এই পরিচয় দিতে দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। একবার ভাবি, ঘাড় গুঁজে চোঁচা দৌড় দিই, ঘটীটার মায়ায় পেরে উঠছিনে। বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি, সে ভরসা নেই। একখানা পিঁড়ি দাও—হাঁপ ছাড়ি।"

রামচন্দ্র একখানা চৌকি নাড়াচাড়া করিয়া সরাইয়া দিল।

দুধের ঘটীটা নামাইয়া নীলকণ্ঠ বসিয়া পড়িলেন এবং নামাবলীর সাহায্যে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তামাক খাচ্ছ না?"

পুত্রকে ডাকিয়া রামচন্দ্র বলিল, "ওরে ভোঁদা, তামাক সেজে দিয়ে যা। একখানা কলার পাতা আন্‌বি।"

ভোঁদা আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। নীলকণ্ঠ কলার পাতার একটা নল প্রস্তুত করিয়া কানে গুঁজিলেন। ভোঁদা হুঁকার জল পাল্টাইয়া নীলকণ্ঠের হাতে দিল। নীলকণ্ঠ কয়েক বার দম টানিয়া রামের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, "দুধের কথা জিজ্ঞাসা করলে,—দাঁও পেলে কেউ ছাড়ে না। পর্ব্বের গন্ধ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে? চার পয়সার জায়গায় চার গণ্ডা পয়সা সের নিলে। গলায় ছুরি দিবি ত' বুকের উপর হাটু গেড়ে সামনাসামনি দিবি? অরাজক—অরাজক! সে রামরাজ্য কি আর আছে—রাক্ষসের রাজ্য—অল্পতে কোন শালার পেট ভর্ত্তি হয় না।"

আর কয়েক বার হুঁকাটায় টান দিয়া তিনি বলিলেন, "গরীব বামুনের কথা শুনে ত তোমার কোন লাভ নেই, রামচন্দর! কেবল প্রাণের দরদে খট্‌কা নেড়ে দেওয়া। একটি টাকা কোন গতিকে জোট-পাট করেছিলাম, সে ত দুধের মালিকের পায়ের তথায় রেখে এলাম। এ দিকে অষ্টমীর-উপবাস। দুধ, গুড়, নারকেল, ময়দা, কলা সবই ওই একটা টাকার মধ্যে গৃহিণীর বরাদ্দ ছিল। এই চার সের দুধের কল্যাণে তা ফুঁকে গেল। আজকের দিনে ধার চাইতেও নেই। দশ মাস পেট—আমি ভিখিরী বামুন—আমি আর কি করব বল; দুধ চুমুক দিয়ে প'ড়ে থাকুক।"

রামচন্দ্র বিজ্ঞের মত বলিল, "শুধু দুধ ব'লে নয়, সকল জিনিষেরই ঐ এক দশা! এর পর মানুষে মানুষ ছিঁড়ে খাবে।"

রামচন্দ্রের এ হিতোপদেশ শুনিবার জন্য নীলকণ্ঠ থাবা গাড়িয়া বসিয়া পড়েন নাই। রামচন্দ্রের বাগানে বিস্তর নারিকেলগাছ ছিল, তিনি জানিতেন। দাবার এক কোণে দেখিলেন, ঝুনা নারিকেলও অনেকগুলি রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এত নারকেল পেড়েছ, নাড়ু করবে না কি?"

রামচন্দ্র কহিল, "নাড়ু কিছু হবে বৈ কি। বাড়ীতে ত পূজো নেই, এ সব বিক্রী ক'রে ফেলেছি। কা'ল কতক নিয়ে গেছে—আজ বিকালে বাকী সব নিয়ে যাবে।"

নীলকণ্ঠ বেগতিক দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উঠানে দাঁড়াইয়া আর একবার অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন মনে করিলেন। কিন্তু তত কিছু করিতে হইল না। রামচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া তক্তপোষের নীচু হইতে এক জোড়া নারিকেল বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। বলিল, "গিন্নীমা'র উপবাস—টাকাটা ত দুধের বাবদে দিয়ে এলেন। নারকেল দুটো নিয়ে যান।"

বগলে লাঠি, এক হাতে নারিকেল ও অপর হাতে দুগ্ধের ঘটীটা লইয়া নীলকণ্ঠ টলিতে টলিতে চলিলেন। কিছু পথ চলিয়া বাজারে যাইবার এক তেমাথা রাস্তার ধারে এক গাছতলায় বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই জনকয়েক লোক বাজারে যাইবার জন্য ঝুড়ি মাথায় করিয়া আসিতেছে—তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছোট ছেলে ছিল। তাহার ঝুড়ির পরিপুষ্ট ও সুপক্ক কদলীগুলি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীলকণ্ঠ হাঁক দিয়া বলিলেন,—"ওরে ছোঁড়া, ঝুড়িটা নামা ত দেখি!"

ছেলেটি ঝুড়ি নামাইলে তাহার সঙ্গের লোক কয়টিও দাঁড়াইয়া গেল। নীলকণ্ঠ কহিলেন,—"বাঃ! এত বড় মর্ত্তমান কলা অনেক দিন চোখে পড়েনি। সুপুষ্ট ফল হ'লে সর্ব্বাগ্রে দেবতার ভোগ দিতে হয়—তা দিয়েছিস ত?"

ছেলেটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—"ছেলেমানুষ, জানে না কিছু; তোমরা ত বোঝ, প্রথম আর প্রধান ফলটি দেবতার ভোগে না দিলে পয়সার ঠাঁই হয় না। তোমরা ভাব বৃথা গেল! তা যায় না। গাছে চতুর্গুণ ফলে আর চারগুণ দরে বিক্রী হয়। অবশ্য প্রত্যেক কাঁদির কলাই যে দিতে হবে, তার কিছু মানে নেই। কিন্তু এমন সুপুষ্ট ফল না দিলেই যে মন খুঁৎ খুঁৎ করে।"

সঙ্গের লোক কয়টি বলিল,—"সে আমরা জানি। আমরা দিয়েও থাকি।" তাহার পর ছেলেটিকে বলিল,—"ঠাকুরমশায় কি বল্‌ছেন, বুঝেছিস? এমন ফল ধরেছে গাছে—দেবতার নামে তোর বাপ কিছু উৎসর্গী করেছে?"

ছেলেটি বলিল,—"না।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—"তা এখনও হাত-পথ রয়েছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ব্রাহ্মণ এক দেবতা। ছেলেটার ভাগ্যি ভাল, তাই ঠিক সময়েই দেখা হ'ল। আমার ত দুধের ঘটী নিয়ে কোন্ কালে চ'লে যাবার কথা; এখানে বা বিশ্রাম কর্‌তে বস্‌ব কেন? দেবতা তুষ্ট হ'লে হয় ত সুফল ফল্‌তে পারে, বুঝলি ছোঁড়া!"

নীলকণ্ঠ ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"তোমরা হাস্‌ছ যে? শাস্ত্র-টাস্ত্রের খবর রাখ—না শুধু কলা বেচেই বেড়াও? ব্রাহ্মণকে গোদান, ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান এ সব শোন নি কখনও? বড়লোকের বাড়ী ক্রিয়াকাণ্ডও দেখ নি?"

তাহারা বলিল,—"সে জন্যে হাসিনি ঠাকুর মশাই। ছেলেটা কিছুই বোঝে না, তাই হেসেছি। বামুনে আর দেবতায় কি তফাৎ আছে ?"

তাহার পর তাহারা ছেলেটিকে বলিল,—"এঁরা দেবতুল্য লোক—ঠাকুর মশায়কে কিছু দিয়ে যা; হয়ত তোর কলা বেশ দরে বিক্রী হবে।"

ছেলেটি এক ছড়া কলা হাতে লইয়া চারিটি কলা ছিঁড়িতে গেল। নীলকণ্ঠ অমনই হাঁ—হাঁ করিয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িলেন। বলিলেন,—"একি বেচা-কেনার যায়গা রে, ছিঁড়ে-ছুটে আধখানা ক'রে দিচ্ছিস্? দেবতার স্থান—একটু ভয় রাখিস। ছড়াটা আর ছিঁড়িস নে—ছেলেমানুষ তুই—অখণ্ড জিনিষ ভোগ দিতে হয়।"

ছেলেটি ভ্যাবাচাকা মারিয়া গেল এবং কলা ছড়াটা নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া ঝুড়ি মাথায় তুলিল।

নীলকণ্ঠ বলিলেন,—"যা ছোঁড়া, কিচ্ছু, ভাবিস্ নে। আমার আশীর্ব্বাদে হাসিমুখে ঘরে ফিরতে পারবি।"

ছেলেটির হাসিমুখ নীলকণ্ঠের আশীর্ব্বাদে না হউক, অষ্টমীর কৃপায় হয় ত হইতে পারিবে। কিন্তু আপাততঃ সে ঝুড়িটা মাথায় লইয়া ম্লান মুখে চলিয়া গেল।

নীলকণ্ঠ নারিকেলের সহিত হাতে কলা-ছড়াটা কোন রকমে সাপটাইয়া ধরিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে চলিতে লাগিলেন। কষ্টে তাঁহার কপালের ঘর্ম্মবিন্দুগুলি একাকার হইয়া যাইতেছিল। শুধু তাঁহার সংগৃহীত অবস্থার অতিরিক্ত লোভনীয় দ্রব্যগুলির দ্বারা গৃহিণীর জলভরা ড্যাবডেবে চক্ষু দুইটি কিছু স্নিগ্ধ হইতে পারিবে ভাবিয়া তাঁহার বিচ্ছেদ-কাতর অন্তরটি অনেকখানি জুড়াইয়া উঠিতেছিল।

বলির অনেক পূর্ব্বেই ঘোষেদের বাড়ী তখন বলিদানের বাজনা বাজিয়া

উঠিয়াছিল,—বোধ করি, লোক জমাইবার জন্য। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হিড়িকে পথ চলা দায়। কত রঙ-বেরঙের সাজ্জ-সজ্জা। আবার কাহারও অঙ্গে বা ধড়াচুড়া—লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্রও নাই। অথচ আনাগোনা আনন্দ উৎসাহের কমতি দেখা যায় না। আগমনীর অমৃতময় রসধারায় সকলেরই প্রাণ উৎফুল্ল। তা হউক, কিন্তু দুধের ঘটীটা সামলান যে দায়! ছেলেগুলা ঘাড়ের উপর পড়িবে না কি? কি মুস্কিল, তাড়া করিবারও যে উপায় নাই? মুখের কপচানিতে শুধু খিল খিল করিয়া হাসে। নীলকণ্ঠের ঘটী হইতে কয়েকবার দুধ চল্‌কাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাঁহার হুঁসিয়ার হস্ত বলিয়াই রক্ষা পাইল। যাহা হউক, হিন্দুর এত বড় একটা শুভ দিনে কাহারও বাপ-পিতামহের পিণ্ড লোপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হয় নাই—ছেলেদের দুরভিসন্ধিরও পরিচয় কিছু তিনি পান নাই। শুধু তাড়াতুড়ি দিয়া কোন গতিকে দুধের ঘটীটা বাঁচাইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। উঠানে পা দিয়া ডাকিলেন,—"ভূতি—ভূতি! দুধের ঘটীটা ধর। বোঝাবিড়ে নিয়ে পড়ি কি মরি! পথ কি কম! তেমনই সূয্যি দেবের কৃপা—চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে। নে—নে, ধর, হাতে-পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধ'রে গেল।"

ভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাই-বোনরাও বাহির হইয়া আসিয়া নীলকণ্ঠকে খালাস করিয়া লইল। তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দাবায় উঠিয়া জলচৌকিখানার উপর বসিয়া পড়িয়া মেয়েকে বলিলেন, "পাখা দে।"

ভূতি পাখা আনিয়া দিলে নীলকণ্ঠ জোরে জোরে টানিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িবে—সে কৈ? গৃহিণীর মুখখানা কি এখনও ভারী হইয়া থাকিবে?

নিষ্ঠুর চোর সাজিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়াও কি তিনি দেখিবেন না যে, কি সকল দ্রব্য আসিয়া পৌছিল? নীলকণ্ঠের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রাণটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

ভূতি জিজ্ঞাসা করিল, "পা ধোবার জল দেব?"

নীলকণ্ঠ শুষ্কমুখে বলিলেন, "না।"

গায়ের ঘাম মরিয়া গেল, তবুও কালীতারার সাক্ষাৎ নাই। নীলকণ্ঠ উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা কোথায়? দুর্য্যোগটা কেটেছে? শরতের মেঘত বেশীক্ষণ থাকবার নয়। এখনও যে অনেক জিনিষ বাকী, পায়ে বল পাই কিসে?"

কালীতারা সত্য সত্যই বেড়াব ফাঁক দিযা স্বামীর আনীত দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া লইযাছিল এবং দুগ্ধের ঘটীটা দেখিয়াই তাহার প্রাণের সকল কালিমা দুব হইযা জুড়াইযা গিযাছিল। তাঁহার পর স্বামীর সস্নেহ আহ্বানে ঝগড়া-ঝাটি ভুলিয়া গিযা সে দ্বাবের কাছে কবাট ধরিয়া আসিযা দাঁড়াইল। কৌটা হইতে এক তর্জ্জনী তামাকপোড়া মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দিযা কহিল, "অনেক দুধই ত এনেছ। বেশী পথ হেঁটেছ বলছিলে—থাক্, আর কোথাও যেযে কায নেই। ভূতির আবার কলায় শুধু মিষ্টি হয় না—গুড় না হ'লে জাত যায়।"

ভূতি দাঁত খিচাইয়া কহিল, "বাঃ রে, তোমার কানে কানে বলেছি না কি?"

গৃহিণী স্বামীর অলক্ষ্যে একটা কিল দেখাইযা বলিলেন, "কানে কানে বল্‌বি কেন? খেতে ব'সে যে অনাছিষ্টি করিস।"

ভূতি আর কিছু বলিল না। নীলকণ্ঠ বলিলেন, "শুধু গুড় কেন, ময়দাও ত আন্‌তে হবে। দেখি—" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

৩

"শীতল, বাড়ী আছ ?"

"কে—চক্কোত্তি মশায় ? আসুন, প্রাতঃপেন্নাম, কি মনে করে ?"

"জল দাও এক গাড়ু, পা-টা ছড়িয়ে বসি। বাবা! তোমার বাড়ী আসতেই আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। জলকাদার মধ্যে বাস কর কি ক'রে ? ঘরের দোরে গগনার বাড়ী এত গুড় রয়েছে, তা রুচল না—স্বরূপ দাসের গুড় চাই। ওদের আর কি ? মুখে ফরমাস্ করতে ত আটকায় না ; এদিকে আমার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে যায়। গুড় দিতে হবে যে একখানা।"

শীতল জিজ্ঞাসা করিল, "কলস ?"

"হাঁ।"

"গুড়ের দর যে চ'ড়ে গেছে, চক্কোত্তি মশায় !"

নীলকণ্ঠ অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিলেন, "ট্যাঁকের কড়িও চ'ড়ে গেছে। তোমরাও হা কচ্ছ—এ দিকেও খা খা কচ্ছে। একটা সামঞ্জস্য কর—নইলে দাদা ! কারও সুবিধে নেই। কত ক'রে বিকচ্ছ কলস ?"

"চার টাকা।"

"চা—র—টা—কা ?"

নীলকণ্ঠ শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আড়াই টাকা ছিল যে ?"

"তা ছিল। পঞ্চমীর দিন হিঁদেলপুরের হাটে চার টাকা ক'রে বিক্রী হয়েছে।"

"গিয়াছিলে না কি সে হাটে ?"

"না।"

"বে তারে কথা শোন, সে-ও একটা ভাল কথা। হিঁদেলপুরের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের সম্পর্ক কি ? এ দাঁতখামটি একাই কি তুমি এঁটেছ ?"

"না চক্কোত্তি মশাই! এ গাঁয়ের সবাই সে খবর পেয়েছে—আর সেই দরেই বিকচ্ছে।

নীলকণ্ঠ মুখখানা বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ্! আমি ত আড়াইটে টাকা ট্যাঁকে গুঁজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুম পাড়ছিলাম যে, শীতলের কাছে গেলেই গুড় একখানা পাব। অষ্টমীর উপবাস--বেলা এতটা হ'ল—এখন কি করি বল ত? ছাপোষা মানুষ আমরা, পাঁচ টাকার যায়গায় দশ টাকা চাইলে তখনই-তখনই ত টাকা গজিয়ে ওঠে না?"

শীতল বলিল, "তা আপনি একখানা ভাঁড় গুড় নিয়ে যান, দেড় টাকায় পাবেন।"

নীলকণ্ঠের ট্যাঁকে দেড় টাকা কি দেড়টা কড়িও ছিল না। শীতল গুড়ের দর চড়াইলে তাঁহার ট্যাঁকের কড়িও কমিত। যাহা হউক, তিনি কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, "শীতল, আমার বাড়ীর অবস্থা জান না, এক ভাঁড় গুড় এক বেলাতেই ফুঁকে দেবে। আয়-পয় না দিলে আমরা গরীব লোক কি বাঁচতে পারি? আড়াইটে টাকার উপর আর দেড়টা টাকা জোগাড় ক'রে তোমার কাছ থেকেই এক কলস গুড় নিয়ে যাব। তোমার বাবা ডাকষেটে গাছী ছিল। স্বরূপ দাসের গুড় নয় ত—মিছরীর দানা! বাবার হাতখানা পেয়েছ ত? ফলেন পরিচীয়তে—খেলেই বুঝতে পারা যাবে। এত বেলায় আর যাই বা কোথায়? আর গেলেই বা কি ফল হবে? সম্বল ত এই আড়াইটে টাকা! তুমি দাদা, বরং এক কায কর। বাটিতে ক'রে এক খাম্‌চা গুড় দাও—আজকের এ মুস্কিলের আসান ত হোক, শেষে কা'ল নাগাদ গুড় এক কলস নিয়ে যাওয়া যাবে।"

শীতল আর কি করিবে—ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। নীলকণ্ঠ বাহির হইতে হাঁক দিয়া বলিলেন, "ভিক্ষের ধন ব'লে যেন ঝোলা-মালা দিও না।

আর বাটিটা একটু বড় সড় দিও—ছেলে পুলে রয়েছে। স্বরূপ থাকতে গুড়ের ভাবনা বড় একটা আমার ছিল না। সেকেলে মানুষের নজরটাও বা কি উঁচু ছিল। বাপের ধারাটা রেখো—বুঝলে শীতল! সংসারে নামটাই সার বস্তু। তোমার বাবা চ'লে গেছেন—তাঁর নামটা এখনও আমরা পাঁচ জন করছি। পয়সা-কড়ি কিচ্ছু না—বুঝলে শীতল! চোখ বুজলেই অন্ধকার!"

এত কথার পরে শীতল যাহা আনিয়া দিল, তাহাতে নীলকণ্ঠের প্রাণ শীতল হইল। বড় বগুনা-বাটির এক বাটি গুড় লইয়া—নীলকণ্ঠ গৃহে ফিরিলেন।

এখন ময়দাটা বাকী—দোকানের সামগ্রী। এ গৃহস্থবাড়ী নয়—এখানকার পরিচয়টা কিছু গম্ভীর। ফেল কড়ি, মাখ তেল। যাহা হউক, নীলকণ্ঠ হতাশ হইলেন না। 'দুর্গে শ্রীহরি' বলিয়া লাঠি হাতে পুনর্ব্বার তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

নীলকণ্ঠ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,—ময়দার পয়সাটা অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু আজ ত হাত-গাঁট সবই শূন্য। কার দ্বারে যাই, সে লক্ষ্যও শূন্য। নীলকণ্ঠের একটা গানের পদ মনে পড়িয়া কিছু সাহস জন্মিল। "মাতুর কাছে দুধ—রামচন্দ্রের কাছে নারকেল—শীতলের কাছে গুড়—এ সকল পাবার বেশীক্ষণ আগেও ত ভাবিনি যে, কার কাছে পাব। কবি ঠিকই গেয়েছেন,—

'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে।'

দেখি পা-দুখানা কোন্ পথে যায়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নীলকণ্ঠ নন্দ মুদীর দোকানের সম্মুখভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতে হাঁক দিলেন, "নন্দলাল, তামাক খাচ্ছ না কি?"

ঘরের মধ্য হইতে আহ্বান আসিল, "আসুন, দাদা, সাজাই আছে।"

নীলকণ্ঠ দাবার উপর উঠিয়া চৌকাঠের উপর কাচে' বাঁধাই একখানা লেখার উপর—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। ট্যাঁক হইতে চশমার খাপটা বাহির করিয়া—চশমা জোড়া নাকে পরিলেন। পড়িয়া দেখিলেন, বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—"ধারের জন্য অনুরোধ করিবেন না।"

নীলকণ্ঠ চশমা জোড়া পুনর্ব্বার খাপের মধ্যে পূরিতে পূরিতে বলিলেন, "আসব কি - দোরের গোড়ায় যে টিকিট লটকিয়েছ, ঘরে ঢুকতে যে ভয় পাই।" ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কৈ, তামাক দাও।"

নন্দলাল ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকাটি পরাইয়া দিল।

নীলকণ্ঠ চক্ষু বুজিয়া টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোরের মাথার ও অস্ত্রখানি কি গরীবদের জন্য ?"

নন্দলাল হাসিয়া বলিল, "কেন ?"

নীলকণ্ঠ বলিলেন, "তা বৈ কি! ঘোষেদের প্যারী বাবু যদি এসে বল্লেন,—'এক টিন তেল দাও।' আর তা' মুটের মাথায় নিয়ে স্বচ্ছন্দে চ'লে যান ত জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না,—'বাবু, টাকা ?' আর আমি যদি এক সের নুণ মেপে নিয়ে বলি,—'দাদা, পয়সাটা কা'ল দেব।' তা হ'লে দশের সামনে আমার আঁচল থেকে ঢেলে নিয়ে হয় ত আমাকে হতমানী ক'রে বসবে। কেমন - কথাটা সত্যি কি না ?"

নন্দলাল আমতা আমতা করিয়া বলিল, "সত্য হ'লেও বড়লোকের টাকাটা মারা যায় না।"

নীলকণ্ঠ ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া বলিলেন, "কে বলেছে তোমাকে ? সবে ত আষাঢ়মাসে দোকান খুলেছ—আজও পাকতে পার নি। মারা যেতে বড়লোকের টাকাই যায়। ছোটলোকের,—পথে ঘাটে মাঠে

তাগাদা—শালা বাঞ্চোত গালিগালাজ—শেষের অস্ত্র,—গলায় গামছা। এতে কি টাকা অনাদায় থাকে? আর বড়লোকের বাড়ীতে ঢোকাই দায়। যদি বা দ্বারবানজীর কৃপা হ'ল, বাবুর সাক্ষাতের সময়ের অভাব। সাক্ষাৎ হ'লে লম্বা ওয়াদা; কড়া তাগিদ করলে—গলাধাক্কা। তারপর নালিশ ফরেদ ক'রে পয়সা খরচ ক'রে যদি বাবুর সঙ্গে টাল সামলাতে পারলে আর ডিক্রী পেলে ত কতক ভাল, নচেৎ ঐ পর্য্যন্ত। ও-সব লটকা-লটকি তুলে ফেল। লোক বুঝে ধার দাও, তা বড় কি আর ছোট কি! দেবার চারা আছে—ইচ্ছে নেই, এ সকল পারদ ছেঁচড়া লোক বড়লোকের ভিতরেই বেশী পাবে। কি রকম তামাক দিলে? সাম্নকে কি? অম্বুরী তামাক? ও-বুঝি কেবল বিক্রীই কর? মহাপ্রাণীকে এক আধ ছিলুম দিও।" একটু থামিয়া বলিলেন, "সে দিন পথে তোমার ছেলেটিকে দেখলাম। ছেলে নয় ত—হীরের টুকরা। ওর কপালখানা সোজা নয়—নন্দলাল! তুমি মুদির দোকান খুলেছ—ও খুলবে জহুরের দোকান। আমি বেশ ধ'রে ধ'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছি। ওর জন্যে পেটে দড়ি দিচ্ছ? আঃ! আমার কপাল! ও নিজের ভাতকাপড় নিজেই গোছাবে। যদি বেঁচে যাও—দেখতে পাবে।"

নন্দলাল বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ। কল্‌কেটা দিন—সাম্নক থেকে এক ছিলিম সাজি।"

নন্দলাল তামাক সাজিতে বসিল। নীলকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘড়ীতে কটা বাজল দেখ ত?"

বড় একটা ক্লক ঘড়ী দেওয়ালের গায়ে টিক্ টিক্ করিতেছিল। নন্দলাল দেখিয়া বলিল, "বারটা।"

"বা—র-টা?" চক্ষু দুটি ঠিকরাইয়া নীলকণ্ঠ বলিলেন, "অম্বুরী

তামাক মাথায় থাক—আমি উঠলাম, নন্দলাল! দোকানের জিনিষ-পত্তর যায়-নি—আজ আবার উপবাস—গিন্নী হয় ত এতক্ষণ ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিলেন। এতটা বেলা হয়েছে, বুঝতে ত পারি নি। এখন বাড়ী থেকে পয়সা এনে সওদা কোরব—জয় দুর্গে।”

নীলকণ্ঠ চৌকাঠের বাহিরে এক পা দিলেন। আবার টানিয়া লইয়া বলিলেন, “ভাবছি কি—ময়দাটা হাতে করেই যাই। গেরস্থ ঘরে আর যা আছে, এ বেলাটা চ’লে যাবে’খন। মেপে দাও ত এক সের ময়দা—হাঙ্গামাটা চুকে যাক।”

নন্দলাল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জিজ্ঞাসা করিল, “পয়সা?”

নীলকণ্ঠ বলিলেন, “ঐ ত রোগ তোমাদের। এতক্ষণ শুন্‌লে কি? বেলা বারটা যদি না শুনিয়ে দিতে, এখুনি ত পয়সা এনে জিনিষ নিয়ে যেতাম। বুড়োমানুষকে কষ্ট দিতে চাও—বল, না হয় খেতে শুতে বিকেলই হয়ে যাবে।”

নন্দলাল বলিল, “ময়দা দেব না ত বলিনি। পয়সাটা পৌঁছে দেবেন।”

এই বলিয়া সে ময়দা মাপিয়া ঠোঙ্গাটা আনিয়া নীলকণ্ঠের হাতে দিল। নীলকণ্ঠ বলিলেন, “অম্বুরী তামাকটা আর বৃথা যায় কেন? আগুন তোল। একটু তেল দাও, মাথায় দিয়ে তেল-তামাক ক’রে যাই।”

তেল-তামাক করিয়া ময়দার ঠোঙ্গাটি হাতে লইয়া নীলকণ্ঠ বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে পর পর তিনটি পুষ্করিণী পড়িলেও তিনি স্নান সারিয়া লইলেন না। কি জানি, অতিরিক্ত বেলার দরুণ কালীতারা যদি আবার চোখে তারা দেখায়। তিনি এক রকম ছুটিতে ছুটিতে বাড়ী চলিয়া আসিলেন। ভূতির হাতে ময়দাগুলি দিয়া বলিলেন, “বেলা

অতিরিক্ত হয়েছে। তোরা মেখে জুকে খেয়ে নে। তোর মা যেন আমার জন্যে অপেক্ষা না করেন। আমার স্নান-আহ্নিক সারতে দেরী হবে।"

এই বলিয়া নামাবলীখানা ভূতির হাতে দিয়া গাড়ু-গামছা লইয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। বড় একটা দায় উদ্ধার হইলে লোক যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে, তাঁহার মনটা তেমনই হালকা হইয়া গিয়াছিল। তিনি কোমর-জলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আহ্নিক করিলেন। সকালবেলাকার সমস্ত ব্যাপারটা মনে উঠিতে তাঁহার মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় উঠানে পা দিয়াই তিনি বিস্তৃত নেত্রে কান দুটি খাড়া করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। ভূতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ভূতি, ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কি রে?"

রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া ভূতি বলিল, "আমার একটা ভাই হয়েছে।"

চক্ষু দুইটি কপালে তুলিয়া নীলকণ্ঠ বলিলেন, "অ্যাঁ—বলিস কি রে? ময়দা-গোলাটা খেতে পেরেছে?"

ভূতি বলিল, "খেতে আর পারলে কৈ?—গুল্‌তে গুল্‌তেই ত ব্যথা ধরল।"

নীলকণ্ঠ ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তাই ত! আজ মহাষ্টমীর দিনে এত জোচ্চুরি বাটপাড়ি—এত যোগাড়-যন্তর—সবই বৃথা গেল! আর 'পুরুষের ভাগ্যে জন' সেইটাই কেবল সত্য হল!"

———

ছেঁড়া জুতো

১

সেদিন সারাটা সকাল চড়াই আর উৎরাইয়ের ধূলি-কাঁকর মাড়াইয়া, ছোট-বড় স্বচ্ছ জলের ঝরণা আর বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া অনিল যখন বাসায় ফিরিতেছিল, তখন তাহার জুতোজোড়ার মস্ত হাঁ করা জায়গাটার মাঝখানে নিজের হাতের সূক্ষ্ম দড়ির যে একটা গ্রন্থি ছিল, হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল।

পথের ধারে কদমগাছের ঘনছায়ায় বসিয়া নাতিদীর্ঘ; দুই সুতার দুটি মুখ এক করিয়া বন্ধন আঁটিতে জিভ্ বাহির হইয়া আসিতেছে, এমন সময় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রমাপ্রসাদের কন্যা লতিকা এবং ইঞ্জিনিয়ার বিষ্ণুপদর মেয়ে রেবা হাওয়া খাইয়া ফিরিবার পথে ছেলেটির এই শিল্পচাতুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেইখানে থামিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

দাঁড়াইবার আর এক কারণ এই যে, ইহার লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গৌরবর্ণের দেহখানা দেখিলে সে দেহে জরা আসিবে বলিয়া ধারণা হয় না। মুখখানা এবং দেহের ভঙ্গী—বাঙলাদেশের না হইলে যুবকটিকে কাবুল কিম্বা ঐ রকম কোন সজীব দেশের বলিয়া মনে হওয়া কিছু বিচিত্র হইত না। তাই পথের লোকের পক্ষে ইহাকে চোখ বুজিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া যাওয়া কঠিন।

রেবার শীলতাজ্ঞান ছিল কিছু কম। সাজপোষাকের ঘোর-ঘটার দিকে তাহার ঝোঁক বেশী। সেদিনও ইহার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। পায়ে হিলওয়ালা জুতো, পরণে আসমানী রংয়ের সাড়ী, হাতে রিষ্টওয়াচ,

চোখে চশমা,—এই সব। লতিকার বেশ অতি সাধারণ। সেমিজের উপর—একখানা লাল চওড়াপাড়ের সাড়ীমাত্র, আর একটা সাধারণ জামা।

মুখ তুলিয়া চাহিতেই অনিল দেখিল রেবা-মেয়েটির হাসিতে বিদ্রূপের এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী। মায়ের জাতি বলিয়া সসম্ভ্রমে মাথাটি সে আবার নীচু করিয়া লইল।

চোখে-চোখে মিলিতে রেবাও কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতক্ষণ এখানে আছেন? আমাদের একটা চাকর—হাতে টিফিনকেরিয়ার—এপথে যেতে দেখেছেন?"

অনিল মুখ তুলিয়া বলিল, "না। আমি অল্পক্ষণ এখানে আছি। আপনারা হাসলেন কেন? আমার এই মেরামতের কাজ দেখে? এ এমন-কিছু না, ছেঁড়ার মাঝামাঝি জায়গাটায় সুতোর একটা বাঁধন দিয়ে আটকে রাখ্ ছি। এইভাবে ত মাসদেড়েক চল্‌ল - আরও মাস-চারেক কাটবে বোধ হয়।"

স্বরে কোন উত্তেজনা ছিল না—যেন কতদিনের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ মানুষ। উভয় দিক্‌কার যে বয়স, তা'তে এরূপ নির্জ্জন পথে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা বলা লোকের চোখে যে বিসদৃশ ঠেকিতে পারে একথা মেয়েদের মনে উঠিতে অবকাশ পাইল না। রেবা হাসিয়া বলিল, "এভাবে দেড়মাস চালানোর পর আরও চারমাস জুতোজোড়ার সঙ্গে সম্পর্ক আপনি রাখতে চাইছেন?"

অনিল বলিল, "তার কারণ, ওদের আমি যত্নে রাখি—বিশ্রাম দি—সব সময় খাটিয়ে নিইনে। আর নেহাৎ ওরা না ছাড়লে ত্যাগও করিনে—যেমন সাপে হঠাৎ খোলস ছাড়ে না। আজ একটু জঙ্গলের পথে ঘুরব ব'লে পায়ে দিয়েছিলুম, নইলে দরকার হ'ত না।"

অনিলের কথাবার্ত্তা খোলা এবং সোজা। যাহাদের দৃষ্টি তলায় না

ভাসিয়া চলে—তাহাদেরও মনে একটা নেশার আমেজ আসে। রেবার পরিহাসপটু মন সেই আনন্দটুকুই গ্রহণ করিতেছিল। কিন্তু নববধূ যেমন রাত্রি-বাসরে প্রণয়ীর নিকট মুখের সবখানি ওড়্না খুলিয়া ফেলে, লতিকার অন্তরে ইহার সমস্তখানি প্রকৃতির তেমনি একটা সুন্দর লীলা গোপনে চলিতেছিল। রেবা বলিল, "জুতো-জোড়াটা মুচির হাতে ঘুরে এলে বোধ করি চারমাসের উপর আরও দু'মাস যেতো।"

অনিল বলিল, "একেবারেই না। কল্‌কাতায় থাক্‌তে একবার যাচাই করেছিলুম; যে সস্তাদরের জুতো আমার—সে দামে একজোড়া নূতন হয়। তাও না হয় সারালুম, মাসখানেক হাঁটাহাঁটির পর আবার সেই মুচিকের দলে। অকারণ পয়সা দিতে যাই কেন? এ একরকম পয়সাও বেঁচে গেল, কাজও চ'লে যাচ্ছে।"

রেবা বলিল, "বেশ হিসেবী লোক আপনি। পয়সার উপর আপনার খুবই ঝোঁক্।"

অনিল বলিল, "হবে।"

তাহার ভাসা চক্ষুদুটি হাসির দীপ্তিতে আরও অধিক ভাস্বর হইয়া উঠিল।

রেবা চশমাজোড়া পুঁছিয়া লইয়া পুনর্ব্বার চোখে পরিল। হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকেও একবার চাহিয়া দেখিল—প্রায় বারটা।

লতিকা মৃদুস্বরে সঙ্গিনীর গায়ে একটা টিপ্ দিয়া বলিল, "আর কত-কাল দাঁড়িয়ে কাটাবে? চল।"

"হাঁ, চল যাই। আপনি বুঝি এখানে সবে এসেছেন? আর কোনদিন দেখিনি ত আপনাকে।"

অনিল বলিল, "দিন-পনর এসেছি।"

"দিন-পনর?" রেবা সচকিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এখানকার পদ্ম-

দীঘিতে যান্‌নি আপনি ? দীঘি কেন বলে জানিনে—একটু বাষ্পও ত্রিসীমানায় নেই। প্রকাণ্ড একটা মাঠ—সবুজ ঘাসে ঢাকা—গাছপালা লতা-গুল্মে বেশীর ভাগ জায়গায় ছায়া বিছিয়ে রেখেছে। যেন মায়াপুরী ! সকালে-বিকেলে এখানকার লোকে আর ঘরে থাকে না—সব সেইখানে যায়।”

অনিল হাসিয়া বলিল, “কেন, একের শ্বাস অপরে গ্রহণ করতে ? কল্‌কাতাতেও দেখি এই কাণ্ড ; পার্কগুলোয় লোকে গিজ্‌ গিজ্‌ করে। এখানে এসেও সেই বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণ নেই। আপনারাও বুঝি সেই মায়াপুরী থেকে ফিরে চলেছেন ?”

রেবা হাসিল। বলিল “বেলা অনেকখানি হ’য়ে গেছে। আসি তবে এখন। নমস্কার !”

লতিকা এবার দুইহাতে একটা ক্ষুদ্র প্রণাম করিয়া বলিল, “আমাদের অসভ্যতা মাপ করবেন।”

অনিল সকৌতুকে লতিকার দিকে দুই চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ধরিল। নিতান্ত অশোভন ও অসামাজিক হইলেও ইহা যে চরিত্রের খুৎ নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার মত কিছুই মেয়ে দুটির মনে উদিত হইল না।

অনিল দু’দিকে দুটি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, “উভয়ের মার্জ্জনাটা আপনি একাই চাইছেন, অথচ আপনি একটি কথাও বলেন নি। তা হোক, আপনার কথা আর ওঁর মুখের কথা—একই কথা। আমি খুব সামান্য ব্যক্তি। আমার আগেই আপনারা সৌজন্য প্রকাশ ক’রে বসলেন। তাহ’লেই দেখুন, কে কাকে ক্ষমা করার যোগ্য।”

লতিকা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

রেবা মনে মনে একটু গরম হইয়া উঠিয়া বিশুষ্কমুখে বলিল, “জ্যেঠা মশায় পথের দিকে চেয়ে রয়েছেন—শুনছ লতি ?” বলিয়া অগ্রসর হইল।

লতিকা তাহার অনুসরণ করিল।

অনিল জুতাজোড়া পায়ে আঁটিয়া দূরে দূরে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

রেবা একবার ফিরিয়া দেখিল, লোকটি পিছু পিছু আসিতেছে। সে পায়ের গতি কিছু মৃদু করিয়া দিল। অনিল কাছাকাছি আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি। একলাই এসেছেন নাকি এখানে ?'

"হ্যাঁ, বাসা ঐ ডান হাতে। সাম্নে যে খড়ো বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে— ওরই পশ্চিম দিক্‌কার চালাটা! দু'টাকা ভাড়া—মাসে। বাড়ীটা হ'চ্ছে যদু কাপালির।"

বিকৃত হাসির মাত্রাটা বাড়াইয়া—অনেকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রেবা ইহাকে বিদ্ধ করিতে করিতে চলিল। মুখে বিদ্রূপের নিরুদ্ধ হাসি ফুটাইয়া রেবা বলিল, "আরও একটু সস্তায় বাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল না ?"

অনিল বলিল, "হয়ত যেত—কিন্তু দুরবস্থার একশেষ হ'ত। যদুর সঙ্গে ট্রেনেই আলাপ। দেখ্‌লাম, মানুষটি ভাল—অসুবিধা হবে না।"

ততক্ষণে ইহারা যদুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রেবা বলিল, "আমাদের আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে। এখন তবে আসি।"

এই বলিয়া তাহারা আরও একটি নমস্কার করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। অনিলও কপালে হাত ঠেকাইয়া যদুর বাড়ীর অঙ্গনে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

২

রমাপ্রসাদের বাড়ী বড় রাস্তার উপর। হলুদে রংয়ের—গোল বারাণ্ডাওয়ালা—দ্বিতল—বেশ ফিটফাট। মাঝখানে কাঁকরের রাস্তা,

বড় রাস্তার সীমানায় ফটকের ধারে আসিয়া মিশিয়াছে। দুইধারের বাগানে গোলাপ, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা দিবারাত্র বাতাসের সঙ্গে মাতলামি করে। ফটকের দু'পাশে দুটি রক্তকরবীর গাছ ফুলে-ফুলে ডালপাতা ঢাকিয়া—পথিকজনকে সম্ভাষণ জানায়। রমাপ্রসাদ ইহারই একটির তলায় দাঁড়াইয়া মেয়েদুটির জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রেবা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হাসিমুখে বলিল, "আজ এক অদ্ভুত জীব দেখে এলাম জ্যেঠামশায়!"

প্রশান্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে স্নেহ বিস্ফুরিত করিয়া রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জীব দেখে এলে? এখানকার পাহাড়ের?"

রেবা হাসিয়া বলিল, "না পাহাড়ের নয়,—সমতলভুমির।"

এই স্বল্প কথায় হাসিল সে অনেক বেশী। পরে ছেঁড়া জুতা সেলাইয়ের ঘটনাটা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, "এই নিরেট নির্ব্বোধ লোকটির যদি কখনও টাকা হয়, মৃত্যুর পরেও যখের ধন আগলে মোহজালে সে জড়িয়ে থাকবে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "এখানে যিনি আসেন, কাকেও ত ছেড়ে কথা বলিনে। একে ত সংসারটাই একটা পান্থনিবাস, তাতে এই স্বজনহীন স্থানে কেউ এলে কি ক'রে দূরে ছেড়ে থাকা যায়? যাব একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তা' বেলা ত অনেক হয়েছে। তুমি আর বাসায় যাবে কেন? দুটি বোনে একসঙ্গে খেতে ব'স।"

রেবার এক খুড়তুতো বোন কলিকাতায় চলিয়া যাইবে বলিয়া থাকা হইল না। সে চলিয়া গেল।

লতিকা সমস্ত দিনটা অন্যমনস্কভাবে কাটাইল। বুকের মধ্যে কি যেন একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার চলিতেছে—ঠিক ধরা যায় না, আবছা, কখনও ভয়ে কখনও বা হর্ষে বুকের মধ্যে এক একটা মৃদু কম্পন তুলিতেছে। দিনের

বেলা জানালায় জানালায় সে উঁকি-ঝুঁকি দিল; সন্ধ্যাকালে সে গামছা কাঁধে করিয়া গামছা খুঁজিল; শাঁখ বাজাইতে ঘণ্টাটি হাতে তুলিয়া ধরিল; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইল।

একদিন রমাপ্রসাদ কন্যাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। রেবা আসে নাই। ফিরিবার সময়—লতিকা আঙুল দিয়া দেখাইল, "বাবা! সে বাবুটি এই বাড়ীতে থাকেন।"

রমাপ্রসাদ অপ্রতিভমুখে বলিলেন, "ওঃ! সেদিন রেবা যাঁর কথা বলছিলেন? মনের কি গতি হয়েছে দেখ! এমন ভুল কিন্তু আগের দিনে ছিল না। চল মা! একবার দেখে যাই তাঁকে।"

লতিকা বলিল, "এখন যাবে? বেলা যে অনেক হয়েছে?"

"তা' হোক। নূতন জায়গায় এসেছেন, কোন অসুবিধায় পড়লেন কিনা—একবার জানা কর্ত্তব্য।"

যদু তখন উঠানের এক পার্শ্বের সীমানার বেড়াটা তালি তুলি দিয়া ঠিক করিতেছিল। রমাপ্রসাদকে দেখিয়া সে হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা প্রণাম করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "একটি বাবু এসে নাকি তোমার এখানে আছেন? কোথায় তিনি?"

যদু বলিল, "আজ্ঞে, ঐ চালাটার ভিতর। রান্না করছেন বোধ করি।"

লতিকা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া সামনের দরজার ঝাঁপখানার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিল, উনানের উপর অনিলের ভাতের হাঁড়িটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। একপার্শ্বে দড়ির একখানা চারপায়া খাট। অনিল তাহারই উপর হেলিয়া পড়িয়া কি একখানা বই পড়িতেছে।

লতিকা গলাখাকার দিয়া শব্দ করিতে অনিল চাহিয়া দেখিয়া চম্‌কা-

ইয়া গেল। কি করিবে না করিবে এইরূপ সমস্যার ভাব লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লতিকার পরনে কালা চওড়াপাড়ের সাড়ী—স্কন্ধে একটা সোনার ব্রোচ দিয়া নীচের সেমিজের সঙ্গে আঁটা। হাতে দুগাছা সোনার চুড়ি। পায়ে জুতা বা অন্যকিছু পরিচ্ছদপারিপাট্য ছিল না। অনিল বলিল, "ঠিক একই বেশ। সেদিন যে-রকম পরেছিলেন, আজও তাই। দুদিনের দেখায় আপনার চলাফেরার একটা ধারা আমি পেলাম। আপনাকে আমার বেশ ভাল লাগ্‌চে!"

লতিকা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। পাছে এই সরল মানুষটি সহজ-ভাবে আরও কত কি বলিয়া বসে—ইহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা এসেছেন আমার সঙ্গে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

তালের পাতার ঝাঁপখানা অর্দ্ধেক পথ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়া অনিল বাহির হইয়া আসিল। বৃদ্ধটির হাসি দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ইঁহার কাছে পাইবার এমন অনেক অমূল্য বস্তু আছে, যাহা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সে একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার দড়ির খাটখানা হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া বাঁশের চৌকাঠের আঘাত সামলাইয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। বলিল, "গরীবের আস্তানায় এলেন আপনারা? এই তুচ্ছ আসনখানা বিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু উপায় আমার নেই। যদুর কাছে—সেদিন এখানকার একজন মহাপুরুষের কথা শুনছিলুম। বোধ করি সে আপনিই হবেন। দীনবন্ধু ছাড়া দীনের ঘরে আর কে যায় বলুন?"

এই বলিয়া খাটের উপরকার কম্বলখানা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সে বিছাইয়া বলিল, "বসুন।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "যদু হয়ত আর কারও কথা বলে থাকবেন। আসুন, আপনার ঘর-সংসারটা আগে দেখি।" বলিয়া সেই অপরিসর দ্বারের ফাঁকে ভিতরে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রান্না বুঝি নিজেই করেন?"

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "খাই নিজে, সুতরাং রাঁধি নিজেই। প্রথম দিনের ভাত চিবুতে দাঁতের শ্রম একটু বেশী হয়েছিল। যদুর ঘরের মেয়েরা বল্লেন,—খেলে পেটের অসুখ করবে। তারপর—হাতা কেটে টিপ্‌তে শিখিয়ে দিলেন। এখন আর কতক মাংস আর কতক হাড় হয় না। হাত বেশ পেকে এসেছে।"

কথাটা নিতান্ত সামান্যভাবে রমাপ্রসাদের অন্তরে তখনি-তখনি শেষ হইতে পারিল না। মনের গোপন কোঠায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আঘাত করিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাত চড়িয়েছেন বুঝি? আর কি রাঁধবেন?"

অনিল বলিল, "ঐ এক—আর ঐ অদ্বিতীয়। দুটি আলু ওরই ভিতরে একযাত্রায় সিদ্ধ হচ্ছে। দুধ আছে—ঘি-ও আছে একটু—আর চাই কি!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাছ্-টাছ্ খান্‌না বুঝি?"

"খাই। কোট রে—ভাজ রে—বিদেশ-জায়গা—বড় হাঙ্গামা।"

যদুর ছেলেটি এইসময় স্কুলের বেতনের জন্য কাঁদাকাটী করিতেছিল। অনিলের কানে গেল। ছেলেটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মাইনে কত?"

ছেলেটি বলিল, "আট আনা ক'রে মাইনে—ছ'মাসের তিন টাকা।"

অনিল জামার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বই-টই আছে ত?"

"আর সব আছে। পাটীগণিত নেই।"

"আচ্ছা। স্কুল থেকে এসে তোমাদের পাটীগণিত কে তৈরী করেছেন, নামটা লিখে দিও।"

ছেলেটি টাকাক'টি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া পা তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

লতিকার হৃৎপিণ্ডটাও উল্লাসে দুলিতেছিল। কিন্তু রেবা এই ঘটনার কথা জানিতে পারিল না, এই একটুখানি বেদনার খোঁচা সে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল।

সে বলিল, "বাবা! এদিকে ভাত বুঝি হ'য়ে গেছে। পথে পথে বেড়িয়ে এলুম—কাপড়খানা ছাড়তে পার্‌লে, আমিই না হয় নামিয়ে দিয়ে যেতুম।"

অনিল সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "রান্নার প্রথম অংশটা আপনাদের মত আমি বেমালুম আয়ত্ত ক'রে ফেলেছি। কাটকুটোগুলো ঠেসেঠুসে জ্বালটা বেশ উস্‌কে দিতে পারি। শেষের বেলায় ফেন গাল্‌তে হাঁড়ি সরে—কি হাঁড়ি সাম্‌লাতে বেড়ি সরে—মুখের সে আতঙ্কের ভাবটি যদি দেখেন, আমার উপর আপনাদের আর শ্রদ্ধা থাক্‌বে না।"

রমাপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, "মা! ফেনটা তা' হলে তুমি কি গেলে দেবে?"

"দিতুম ত! কাপড়খানা না ছাড়্‌লে কি ক'রে দিই?"

অনিল সুটকেশ খুলিয়া নরুণ পেড়ে একখানা ধোয়া ধুতি বাহির করিয়া খাটের একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

লতিকা কাপড়খানা বামহাতের মুঠায় লইয়া ঘরের পিছনের দিক্‌টায় চলিয়া গেল।

অনিলেরই কাপড় এখানা। পরিতে দেহে তড়িৎ খেলিতেছে। সমস্ত

ক্ষণটা এইরকম তড়িৎ-সঞ্চার চলিলে ফেন গালা হইয়াছে আর কি! হাঁড়ি সরে কি বেড়ি সরে—এবার যে দুইজোড়া চোখে একযোগে দেখিবে। কম্পিতবক্ষে সেমিজশুদ্ধ ছাড়া কাপড়খানা নিকটের পুঁইমাচার উপরে জড় করিয়া রাখিয়া, দেহের কাপড়খানা আঁট-সাট করিয়া লইয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিল।

লতিকার হাত দুটি বেড়ির সঙ্গে সঙ্গে নড়িয়া-চড়িয়া উপরে উঠিতেছে—যেন পদ্মেরই দল মেলিতেছে। অনিল ইহার সুকুমার রূপ-রস দুই চোখে ভরিয়া লইতে লাগিল। ফেন গালা শেষ হইলে লতিকা হাঁড়িটায় একটা ঝাঁকানি দিল।

অনিল বলিল, "আমার আনাড়ি হাতে ফেনের সঙ্গে কিন্তু অর্দ্ধেক-গুলো ভাত বের হ'য়ে আস্ত।"

রমাপ্রসাদ চক্ষুদুটি অর্দ্ধমুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'যার কাজ তারই সাজে ভাল।"

ভাত বাড়িয়া রাখিয়া কুয়ার জলে অনিলের কাপড়খানা কাচিয়া আনিয়া লতিকা রৌদ্রে শুকাইতে দিল। ঝাঁপখানায় ভর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার হাতে একখানা বই দেখ্‌ছিলুম—কি বই?"

অনিল বলিল, "চৈতন্য ভাগবত।"

"শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের খবরটা কোনো বইতে ঠিকমত পাইনে। একবার বইখানা পেলে প'ড়ে দেখ্‌তুম।"

অনিল খুসী হইয়া বইখানা তাহার হাতে দিল।

পথে রমাপ্রসাদ বলিলেন, "চমৎকার ছেলেটি! এরই মধ্যে—জীবনটি একটি বিশিষ্ট নিয়মের অধীন ক'রে ফেলেছেন। রেবা সেদিন বল্‌ছিল,—যখের ধন আগ্‌লে প'ড়ে থাকবেন। ছেলেমানুষ কিনা—চোখ এখনও খোলে নি। চোখ খুললে দেখাটা কি অত শীঘ্র ফুরায়?"

লতিকার পা দু'খানা বিহ্বল-আনন্দে কাঁপিতে লাগিল।

৩

পরদিন পাহাড়ের কতকটা অংশ চক্কর দিয়া রমাপ্রসাদ যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, লতিকা বলিল, "আজ খুবই সকাল সকাল ফেরা হ'ল—না বাবা?"

রমাপ্রসাদ কহিলেন, 'হ্যাঁ। ওদিকে অনিলবাবুর আবার ফেন গালার সময় হ'য়ে এল। কাল থেকে মনে করছি,—ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থাটা আমাদের ওখানেই করব। কি জানি কথাটা কি ভাবে নেবেন?"

কতকগুলো চুল অসম্বদ্ধ কবরী এড়াইয়া কপালে আসিয়া পড়িতেছিল, সেগুলি কানের-পিঠের চুলের মধ্যে ঠাসিয়া দিয়া বিনুনীটা আঁট-সাঁট করিয়া কাঁটা গুঁজিতে গুঁজিতে লতিকা চিন্তিত মনে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। রাঁধা-বাড়ায় অনভ্যস্ত এই মানুষটির প্রতি পিতার মমত্বের পরিচয় আন্তরিক হইলেও সময়ের কি তাহার এতই অভাব যে, শুধু ভাতের হাঁড়িটায় একটি দিন মাত্র স্পর্শ দেওয়াতেই ঐ অপটু লোকটির হাতের সকল গলদই কাটিয়া গেল?

কাল ভাত বাড়িয়া দিয়াই সে যে বলিয়াছিল, "বাবা, এইবার চল আমরা যাই।" এ তীর নিজের বুকে নিজে ছুঁড়িয়া না মারিলে তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়া অনিলই বা কি করিয়া আসনের উপর যাইয়া বসিত? কিন্তু কত স্ফুট কামনাই যে অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা জানিবার কথা ত অপর কাহারও ছিল না।

সেদিনকার সেই কদম গাছটার কাছে আসিতেই লতিকা চমকাইয়া গেল। যেন অননুভূত আনন্দের একখানা মহাকাব্য এই গাছতলাটিতে নির্জ্জনে রচিত হইয়া ইহার এক একটি শ্লোক প্রতি ফুলে ও পাতায় মৃদু হাওয়ায় দোলা খাইতেছে। পিতা সঙ্গে না থাকিলে হয়ত ইহার গুঁড়িটায়

হেলান দিয়া বসিয়া নীচেকার বাতাসের সজীবতাটুকু অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বক্ষে লাগাইয়া লইত।

পিতা চলিতেছেন—দাঁড়ানও যায় না, বলাও যায় না,—তুমি একটু পা থামাও বাবা!—এই সিদ্ধপীঠ্‌টায় একবার মাথা নত করি।

যদু কাপালিকের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে বলিল, "সেখানে যেতেই যদি বল, একেবারে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গেলেই ত ভাল হয়।"

এ কি এড়াইয়া চলিবার প্রয়াস?—রমাপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন। লতিকাও দেখিল, পিতার মুখের সহজ গাম্ভীর্য্য বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তাঁর যে প্রকৃতি, হয়ত ভাতের হাঁড়ি চাপাবার ঘড়ি-ঘণ্টাই নেই। এই ত বাসা—কি কচ্ছে'ন, চল, একবার খবর নিয়ে যাই।"

অঙ্গনে ঢুকিয়া দূর হইতে উভয়েই দেখিলেন, রান্নাঘরের ঝাঁপ বন্ধ। যদু আঙিনায় বসিয়া কাঠ কাটিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ভোর বেলায় উঠিয়াই বাবুটি কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত দেখা নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা চলিয়া আসিলেন।

হাঁড়ির সম্পর্কে এই একটুখানি কাছে আসিয়া দাঁড়াইবার সূত্র গড়িয়া উঠিতেছিল, আর কিনা ঘুমচোখে হাই ভুলিতে তুলিতে তিনতুড়িতে বাহির হইয়া গেলেন। লতিকার হাসিমাখা মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল।

বিকালে বাড়ীর সম্মুখের ফুলবাগানটি পিতাপুত্রী তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় অনিলকে রাস্তায় ধূলি উড়াইয়া দ্রুতপদে চলিতে দেখিয়া লতিকা সোৎসাহে বলিল, "বাবা! ঐ যে—"

রমাপ্রসাদ দ্রুতপদে ফটকের ধারে আসিয়া ডাকিলেন, "অনিলবাবু!"

অনিল কাছে আসিয়া রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এইটেই কি আপনাদের আশ্রম ?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ। এই কুটীরেই আমরা বাস করি।"

"বাঃ! বেশ মনোরম ক'রে সাজিয়েছেন ত ?"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "চুলগুলো উষ্কখুষ্ক দেখ্ছি। খাওয়া দাওয়া—"

"এইবার সেই চেষ্টায় চলেছি।"

রমাপ্রসাদ সস্নেহে ইহার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লতিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! তুমি যাও। দুটি গরম গরম ভাত এঁকে দিতে হবে।"

লতিকার অন্তরে আবার একটা উল্লাস জাগিয়া উঠিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়া উঠিতেই সকলে দেখিলেন, যে লোহার সিন্ধুকটা কলিকাতা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, নীচে বাঁশ লাগাইয়া সেটাকে একটা চৌকির উপর তুলিতে চারিটি মজুর হিম্‌সিম্ খাইয়া যাইতেছে। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "এখন থাক্ না। কাল আর জনচারেক লোক ধ'রে তুলে নিও।"

বাঁশের যে দিক্‌টা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িতেছিল না, অনিল ঝটিতে যাইয়া সেইদিক্‌টা চাঙ্গা করিয়া তুলিল। রমাপ্রসাদ ব্যস্তভাবে আগাইয়া যাইয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "থাক্—থাক্ অনিলবাবু! আপনি—একি—"

ততক্ষণে সিন্ধুকটা চৌকির উপর উঠিয়া গিয়াছে। রেবাও ঠিক সেই সময় দ্বারে আসিয়া হাজির।

অনিল হাঁপাইতে হাঁপাইতে তক্তপোষের উপর আসিয়া বসিয়া পড়িল। রমাপ্রসাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি লজ্জা পাবেন না। শক্তি চেপে রাখা একটা সাজা।"

বিকৃত মুখভঙ্গীতে রেবার মুখখানায় হাসি উছলাইয়া পড়িতেছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া সে বলিল. "এঁর কাজটা কাল অবধি প'ড়ে থাক্‌লে অপরের চোখে হয়ত আমার মান বেঁচে যেত। কিন্তু আমি মনে কর্‌তুম, জেগে লুকিয়ে থাকলাম। এ রকম জেগে ঘুমোনোর ক্ষতি কি একটু?"

রেবা হাসিয়া বলিল, "সকল কাজেই কি জেগে কাটান্‌ নাকি? আমার ত মনে হয় আপনার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলোর সঙ্গে কাজকর্ম্মের একটা মিল আছে। মাথায় কি চিরুণী দেন না?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "দিই। অনেকে বলেন খাওয়া-দাওয়ার পর শক্ত চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ালে চোখের দৃষ্টি বাড়ে—তাই দিনে ঐ দুটিবার মাত্র। তা' ছাড়া চল্‌তে ফির্‌তে বেরুতে দি-নে। যখন নেহাৎ চুলগুলো কপালের উপর এসে পড়ে, মাথাটায় একটা ঝাঁকানি দি—তাতেই যেটা যেখানে এসে দাঁড়ায়।"

রেবার দিকে একবার ভ্রূ-কুঁচকাইয়া চাহিয়া অতিথিচর্য্যার জন্য লতিকা ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অপ্রীতিকর আলোচনা চাপা দিবার জন্য রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালে একবার আপনার খোঁজ করেছিলুম। এত সময় কেটে গেল—বিশেষ কোন কাজে হয় ত—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রেবা বলিয়া উঠিল, "ওঁর একটা বড় কাজ আছে জ্যেঠামশায়! সে ওঁর জুতো মেরামত করা। আজ বোধ করি পালার দিন ছিল অনিলবাবু?"

অনিলের খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য লতিকার পৃষ্ঠে ছড়ি পড়িতেছিল। কিন্তু ইহাকে রেবার নিষ্ঠুর অপমানের তীব্র জ্বালার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া যাইতে সে দু'পা আগাইতেছিল—দু'পা পিছাইতেছিল। অবশেষে দ্বারের আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল। রেবার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অনিল হাসিয়া বলিল, "জুতোর কৈফিয়ৎ সেদিন একবার পেয়েছেন। কিছু

বল্‌তে বাকী ছিল ব'লেই কথাটা আবার উঠে পড়ল। জুতোর সম্পর্কে যে কথা—আমার সকল খরচপত্রের সম্পর্কেও সেই কথা—এই আপনাদের ধারণা। ধারণাটা ঠিকই। আমি যা খরচ করি, আমার বাবারই টাকা। নিজের উপায় কিছুই নেই। তাঁর মতলব জানি, বুঝে-সুঝে সেই পথেই খরচ করি। আরো একটা টাকার মেশাল ঐ সঙ্গে আছে। সে কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পত্তির টাকা। বিষয়টা বাবার অর্জ্জিত নয়—পূর্ব্বপুরুষের। তাঁদের ত মতলব জানি না। অথচ টাকাটা খরচ করার স্বাধীনতা আমি পেয়েছি। এমন স্বাধীনতা যে ধূলোর মত উড়িয়ে দিতেও পারি। কিন্তু দৃষ্টিটা তাঁদের আমার খরচপত্রের দিকে প'ড়ে আছে। ধমকানি নেই—এমন দৃষ্টি। বুঝুন, সে টাকা আমাকে কি ভাবে খরচ করতে হয়।"

মেয়েটির ধৃষ্টতার জন্য রমাপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিজেই উঠিয়া গিয়া গন্ধতৈলের শিশিটা বাহির করিয়া আনিয়া দিলেন। বলিলেন "এ সকল কথা এখন থাক্। বেলা ত নেই; আপনি স্নানটা ক'রে ফেলুন।"

খাওয়া-দাওয়ার পর অনিল আর অপেক্ষা করিল না। কাজ ছিল, চলিয়া গেল।

যাইবার সময় রমাপ্রসাদ বলিলেন, "কাল দুপুরে এখানে দুটি না খেলে এ অ-বেলায় খাওয়ার দুঃখটা কিন্তু লতিকার কাটবে না। রেবা, মা, তুমিও সকাল সকাল এসে বোনের সঙ্গে ঘরকন্নার কাজে সাহায্য কর —এই আমি চাইছি।"

পিতার কথায় লতিকা প্রথমটা যতখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, রেবার আমন্ত্রণে ততখানি মুসড়িয়া গেল। রেবাকে সে পরিহার করিয়া চলিতে চাহিতেছিল।

৪

পরদিন অনিল সকাল সকাল স্নান সারিয়া হাজির হইল। আসিয়া দেখিল, রেবা বসিয়া জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দিয়া লতিকা নিজের হাতেই অনেকগুলি রান্না শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন অনিলের সাড়া পাইয়া বাকিটা ঠাকুরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সে বাহিরের ঘরে আসিল। তাহার ভয়ের সামগ্রী ছিল রেবা। না জানি তাহার অগোচরে কি শক্তিশেল সে ছাড়ে!

গল্প বেশ সতেজে চলিতেছিল। ইতিমধ্যে ফুলবাগানের ময়দানে বাঁধা একটা গরুর উপর নজর পড়ায় অনিলের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। অবশেষে এক সময়ে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া গরুর দড়িটা খুলিয়া তাহাকে ফটকের বাহির করিয়া দিয়া যেন সে স্বস্তি পাইল।

রেবা বলিয়া উঠিল, "অনিলবাবু গরুটা ছেড়ে দিলেন যে! সেই নূতন গরুটা না জ্যেঠামশায়?"

রমাপ্রসাদ ইহার অদ্ভুত আচরণে কিছু আশ্চর্য্য কিছু বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাইত! ছেড়ে দিলেন! পরের বাঁধা গরু—"

রেবা হাসিয়া বলিল, "মাথায় ছিট আছে।"

অনিল ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই অনেক দিক্‌কার সংযুক্ত ক্রোধ একা তাহারই ঘাড়ে ঝাড়িয়া দিয়া লতিকা বলিয়া উঠিল, "গরুটা ছেড়ে দিলেন? নূতন গরু পাহাড়ে গিয়ে উঠলে আর কি পাওয়া যাবে? পোষ মানেনি যে সেই টানে ফিরে আস্‌বে।"

অনিল মৃদু হাসিয়া বলিল, "ফিরে না আসাইত' ভাল।" লতিকা একবার পিতার দিকে একবার রেবার দিকে তাকাইয়া লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

অনিল বলিল, "গরুটার জাব কাটার লক্ষণ দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, ওর যক্ষ্মা হ'য়েছে। ওর দুধ খেলে উপকার যা হবে অপকার তার অনেক বেশি। ওর গলার দড়ি খুলে দিয়ে বিশেষ কিছু অন্যায় করিনি।"

সকলের চিন্তা আবার একটা স্থির পথ ধরিল। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আপনি কি গরুর চিকিৎসা জানেন?"

"হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে পাটনায় থাকতে একজন অভিজ্ঞ লোকের কাছে কিছু শিখেছিলুম।"

"কিন্তু আমার আশ্রয়ে ও আছে, চিকিৎসা না করিয়ে ছেড়ে দেওয়া কি ভাল হ'ল?"

অনিল বলিল, "গরুদের যে ক'টি যক্ষ্মার রোগী চোখে পড়েছে বিশেষ তদ্বিরেও কোনটা বাঁচেনি। তার চেয়ে প্রকৃতির কোলে ছেড়ে দিলুম—হয়ত বেঁচে যাবে।"

কিছুক্ষণ কেহ আর কোন কথা বলিলেন না। অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "গরুটা কত দিয়ে কিনেছিলেন আপনি?"

"তা' বেশ সস্তায়—পঁয়ত্রিশ টাকায়। দুধ কিন্তু পাঁচ-সাত সের দিত।"

অনিল মনিব্যাগটি খুলিয়া নোট ক'খানা বাহির করিয়া দেখিল, ত্রিশটি টাকা মাত্র আছে। বলিল, "পঁয়ত্রিশটে টাকা ত ব্যাগে নেই। ত্রিশ আছে—ত্রিশই নিন্, আমার সিদ্ধান্তের প্রমাণ যখন হাতে হাতে দিতে পারছিনে তখন ক্ষতিটা উপস্থিত আমারই সহ্য করা উচিত।"

রেবা সবিস্ময়ে দেখিল এ লোকটা খরচ করিতেও জানে। রমাপ্রসাদ একটু হাসিলেন। বলিলেন, "ব্যাগ-ত শেষ ক'রে দিলেন। বিদেশে কাল আপনি খাবেন কি?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "চার-পাঁচদিনের মত চাল আর আলু আছে। বাবাকে লিখলে এর মধ্যে টাকা এসে পড়বে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আচ্ছা ওটাকা এখন আপনার ব্যাগেই থাক্। আপনি এক বিষম বিপদ থেকে বাঁচালেন। তার মূল্যও ত দিতে হবে আমাকে। লতি-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এর পরে না হয় ঋণশোধের একটা ব্যবস্থা করব।"

অনিল নোট ক'খানা ব্যাগে পুরিতে পুরিতে কহিল, "কর্ত্তব্য সাধনের কোনো ফি-নেই রমাপ্রসাদ বাবু, না করলে অপরাধ আছে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর অনিলের প্রতি একটু অতিরিক্ত সৌজন্য প্রকাশ করিবার হেতু তাহাকে সঙ্গে লইয়া রমাপ্রসাদ উপরে গেলেন। এবং ঘরগুলির প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিষপত্র দেখাইয়া ও উহাদের পরিচয় দিয়া ইহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

দিন-দুই পরে ইঁহারা পাহাড়ের ধারে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে রেবাও ছিল। রেবা হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে বলিল, "দেখছেন জ্যেঠামশায়, অনিলবাবুর কাণ্ড? এবার বুঝি রাখালের বেশ।"

রমাপ্রসাদ ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ —"

"ঐ যে! দেখতে পাচ্ছেন না? হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে নাতাড়-ঘাড়ে গরু ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছেন।"

এ-রকমের একটা কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিবার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। রেবা বোধ করি লম্বা-চওড়া চেহারার আর কাহাকেও দেখিয়া ভুল করিতেছ। রমাপ্রসাদ চশমাজোড়া কাপড়ে মুছিয়া নাকে পরিলেন, দেখিলেন অনিলই বটে। আরও দেখিলেন, পাহাড়ের নীচে সুবৃহৎ এক ধান্যক্ষেত্রের চারিধারে কাঁটার বেড়া। বেড়ার এক জায়গায়

আলগা হইয়া পড়ায় পালে পালে গরু ঢুকিয়া পড়িয়া শীষগুলি লুটিয়া খাইতেছে আর অনিল ছুটাছুটি করিয়া ঘর্ম্মাক্তদেহে গরু তাড়াইয়া বেড়াইতেছে। রমাপ্রসাদ বলিলেন,—

"এঁদের তাহ'লে এখানে জমিজমাও আছে।" আরও একটু অগ্রসর হইয়া তিনি ডাক দিলেন, "অনিলবাবু!"

অনিল চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল। তাড়াতাড়ি খুঁটগুলি খুলিয়া কাপড়খানা পায়ের দিকে ছড়াইয়া দিল। বলিল, "আপনারা দাঁড়ান একটু। তাড়িয়ে শেষ করেছি। শুধু এইদুটো গরু ঘুরে-ফিরে বড্ড জ্বালাতন করছে।"

গরুদুটিকে তাড়াইয়া দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে ইঁহারা দেখিলেন, ধানের শীষে পায়ের স্থানে স্থানে ছড়িয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে। রমাপ্রসাদ বলিলেন, "আহা! এ হ'য়েছে কি? আপনাদেরই জমি বুঝি?"

"জমির মালিকের ঠিকানা পেলে ত বেঁচে যেতুম। এত বড় একটা ফসল—কত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এর উপরে। এ ক্ষতি কি চোখে দেখে ফিরে যাওয়া যায়?"

"এ দিকে বেলা যে মাথার উপরে। খাওয়া দাওয়া ত রয়েছে?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "একজনের একবেলার অন্নে মন দিতে গেলে একটা সংসারের সারাবছরের অন্ন মারা যেত।"

রেবা বলিল, "তা' আপনি ভদ্রলোকের ছেলে—আর কতটা কি করবেন? যাদের ফসল তাদের ত মন নেই।"

অনিল বলিল, "মন আছে, দৃষ্টি নেই। যন্ত্রপাতি পেলে কাঁটাকুটি কেটে না হয় জায়গাটা মেরামত ক'রে দিয়ে যেতুম। নিকটে লোকালয়ও দেখিনে। দেখি, পথচল্‌তি কোন লোকের যদি দেখা পাই—একটা খবর তাদের দিয়ে পাঠাব।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "মেরামতের কাজে আপনি বেশ পটু, তা জানা আছে। কিন্তু অস্ত্রপাতি যদি না পান, আর খবর পাঠাতে না পারেন?"

"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জমি আগলে ব'সে থাকতে হবে। সন্ধ্যার সময় গরুগুলো অবিশ্যি বাড়ী ফিরবে; সেই সময় লোকালয়ে গিয়ে একবার সন্ধান নেব।"

এই সময় দূরের পাহাড়ের একটা বাড়ী হইতে ডাকপিওন চিঠি বিলি করিয়া ফিরিতেছিল। অনিলকে দেখিয়া বলিল, "বাবু, তার আছে।"

জরুরি চিঠিপত্র আসিবার সম্ভাবনা অনিলের সর্ব্বদাই থাকিত। সে যখন যেখানে যাইত সেগুলি সময়ে বিলি হইবার জন্য ডাকঘরের কর্ম্মচারী-দের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিত।

তার পড়িয়া অনিল অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তারপর সেখানা রমাপ্রসাদকে পড়িতে দিল। তাহার এক বন্ধু লিখিয়াছে,—পূর্ব্ববঙ্গ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, অধিবাসীদের অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। বাকী সকলে জলের উপর ভাসিতেছে। ইহাদের সাহায্যার্থ তোমার পিতা প্রচুর অর্থ দিতে প্রস্তুত। তাঁর নিজের নড়িবার সামর্থ্য নাই। তুমি যদি সমর্থন কর আর টাকাটা তোমার হাত দিয়া ব্যয় হয়, তিনি দিবেন। তোমার ফটো যদি কাছে থাকে একখানা সঙ্গে এনো।

রমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পিতা—"

"অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।"

"বালীগঞ্জের?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তিনি যে একজন ক্রোরপতি।"

অনিল লজ্জায় জড়সড় হইয়া বলিল, "না—কিচ্ছু না। বারটায় একখানা এক্সপ্রেস্ আছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। সে ট্রেন ধর্‌তে গেলে ত আর খাওয়া হয় না।"

"সেটা এমন কিছু বড় জিনিষ নয়। চলুন, আর দেরী করা যায় না।"

রেবা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আপনার এ ধানের ক্ষেতের উপায় কি ?"

অনিল বলিল, "আমার চোখে যখন ক্ষেতখানা প্রথম পড়ল, বুঝেছিলুম, এই অপচয় রক্ষার জন্য আমারই বুঝি ডাক পড়েছে। আবার এখন যে আহ্বান এল, সে একটা বিরাট কাজের বড় আহ্বান। এখন সমস্ত ফেলে সেই কাজে ছুটতে হবে।"

সে আর দাঁড়াইল না। নক্ষত্রবেগে ষ্টেশনের দিকে বাতাসের আগে আগে ছুটিয়া চলিল।

রমাপ্রসাদ স্তব্ধভাবে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। কী যেন কী অপরাধের ব্যাথায় রেবার চিত্ত ব্যথিত এবং অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের আঘাতে লতিকার চিত্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু হঠাৎ আবার অনিল আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। রমাপ্রসাদ ফরাসের উপর আলোর কাছে বসিয়া কয়েকখানা পত্রের জবাব লিখিতেছিলেন। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যান্ নি ?"

"যাওয়া আর হয়নি। মাত্র তিনটি মিনিটের জন্য ট্রেনখানা ধরা যায় নি। এখন পরের গাড়ী ছাড়া আর উপায় নেই। লতিকা কোথায় ? ভাগবতখানার ভিতর একটা কাগজের মোড়ক ছিল। একটু দরকার আছে।"

রমাপ্রসাদ বলিলেন, "লতি উপরে আছে। বোধহয় লক্ষ্মীর পূজা কর্‌ছে। আপনি যান্ না—প্রসাদটাও পেয়ে আস্‌বেন।"

সুনীল ফটো লইয়া যাইতে বলিয়াছে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায়

সুটকেশটা আতিপাতি করিয়া ঘাঁটিয়া না পাইয়া ভাগবতখানার ভিতরে থাকতে পারে এই সন্দেহবশে সে লতিকার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। লতিকাকে চমকিত করিবার এবং পুনর্ব্বার অন্তরে বিদায়ের একটা ব্যথা-পুলক জাগাইবার একটু গোপন লিপ্সাও হয়ত ছিল।

সেদিন লক্ষ্মীবার ; লতিকা লক্ষ্মীর পূজা শেষ করিয়া ঘরের এককোণে স্থাপিত অনিলের ফটোটার গলদেশে ফুলের একছড়া তাজা মালা দোলাইয়া দিয়া তথায় ধ্যানমগ্ন ছিল।

দ্বারদেশে আসিয়া উঁকি মারিয়া দাঁড়াইতে সমস্ত ব্যাপারটাই একসঙ্গে অনিলের চোখে পড়িল। দেখিল, বন্ধু যাহা চাহিয়াছে চিত্রটির সঙ্গে এই ব্রতচারিণীর চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ঐক্যে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সে চকিত হইল। বর্ব্বর হস্তে এখন সে ইহাকে কি উপায়ে পৃথক করিয়া লইবে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া লতিকার মাথাটা ক্রোড়ের দিকে টানিয়া লইয়া সে বলিল, "একি কাণ্ড করছ লতিকা! রেবা দেখতে পেলে যে তোমার ফাঁসির হুকুম হবে!"

অপ্রত্যাশিত আনন্দে, বেদনায় এবং লজ্জায় লতিকা অনিলের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

বন্ধন

১

চারিখানা বাড়ী গা-জোড়া ছিল। একখানা গ্রামের প্রধান তালুকদার মদন রায়ের চার মহল্লার বাড়ী। একখানা নটবর ঘোষের, একখানা তারিণী বসুর ও অপরখানা মথুর পরামাণিকের। শেষের তিনখানা খড়ের বাড়ী। ঐ বড় বাড়ীখানা ইচ্ছা করিলে যেন ইহাদের ফু দিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। নিকটেই নদী। নদীর কিনারায় সিমুল তলাটায় চারি বাড়ীর চারিটি শিশু কিন্তু প্রতিদিন ঠিক বেলা চারিটার সময় পাঠশালার ছুটির পর আসিয়া একত্র হইত এবং উহাকে দেখিয়া পুলকভরা চোখে খুসী হইয়া উঠিত। কে বড় কে ছোট সে সংগ্রহটা ইহাদের কম। সে সকল বিচারের ইহারা বড় একটা ধার ধারিত না। একজনা কোন কারণে না আসিলে সেদিন ইহাদের খেলাই জমিত না।

কত রঙ-বিরঙের পাখী উড়িয়া বেড়ায় এই নদীর ধারের জঙ্গলটায়। ইহারা কখনও তাহাদের পিছু পিছু ছুটে, কখনও এ উহার গায়ে পড়িয়া হেলিয়া পড়া লাল সূর্য্যটা চাহিয়া চাহিয়া দেখে কখন নদীর পরপারে ডুব মারিবে সে। কখনও সংসার পাতায়—পুতুলের বিয়ে দেয়—বিয়ের আসরে দেনা পাওনা লইয়া ঝগড়াঝাটী করে—কত কি। ইহারা তালুকদার বাড়ীর রায়েদের ছেলে কনক—নটবর ঘোষের ছেলে শঙ্কর—তারিণী বোসের মেয়ে কাঞ্চনলতা ও মথুর পরামাণিকের ছেলে রসিক। পাঠশালার ছুটির পর ইহারা ঠিক ছুটিয়া আসে এইখানে—ভুল হয় না। কাঞ্চনলতার লেখাপড়ার বালাই ছিল না। খাবার জুটেনা প্রতিদিন, বই জোটাইবে কি দিয়ে? সে আগে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। পরে

যে আসিত, পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া পিছন হইতে অপরের চোখ চাপিয়া ধরিত। কাঞ্চন হাতখানা টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া বলিত, কনকদা—শঙ্কর দা—তবে রসিক দা নিশ্চয়ই। এইরূপে চারিটি দেবশিশু স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া জায়গাটি যেন পবিত্র করিয়া তুলিত। ইহাদের ছেলে-বেলাকার প্রীতি-বন্ধনের সে সাক্ষীটাই দাঁড়াইয়া আছে সেই একই স্থানে—নিজেরা কিন্তু কে কোথায় গিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

রসিক নাপিতের ছেলে। বাপ নাই, মা ছিলেন। আর সেই সঙ্গে একটি ছোট ভাই আর দুটি অনূঢ়া ভগিনী লইয়াই তাহার সংসার। সে বিবাহ করে নাই। বয়স চব্বিশ পঁচিশ, ছিপছিপে গড়ন, রংটা কালো! চোখ দুটি দেখিলে চতুর বলিয়া মনে হয়।

মাস ছয়েক গেল তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বহুদিন সে গ্রাম ছাড়া। আবাদ অঞ্চলে এক জমীদারের কাছারীর নায়েবের কাছে সে থাকে। ছুটির সময় তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদেরই বাড়ীতে সে যাতায়াত করে। বাড়ী বড় একটা আসে না। পিতার মৃত্যুর খবর পাইয়া এবার সে বাড়ী আসিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সে দেখিল, তাহাদের ভিটেটাই শুধু বজায় আছে। পাশের সমস্ত জমী জায়গা রায়েদের প্রবর্দ্ধমান বাড়ীটা আসিয়া গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে। মদন মারা গিয়াছেন। তাঁহার ছেলে কনকই এখন সে বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। কাহাকেও নাকি সে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। ছেলে বেলাকার সৌহার্দ্দের কথা ভাবিয়া রসিক একটা নিশ্বাস ছাড়িল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জমীটার উপর বাড়ী করলে, তুমি কিছু বলনি মা?"

মাতা বলিলেন, "তাদের জমীর দরকার, নেবারও শক্তি রয়েছে, বললে তারা শুনবে কেন?"

রসিক বলিল, "কেন, ওদের সংসারে লোক সংখ্যা কি খুবই বেড়ে গেছে আজকাল ?"

মাতা বলিলেন, "তোর আর বুদ্ধি শুদ্ধি পাকবে না দেখছি। জমীদার মানুষ ওরা—সম্ভ্রম গৌরব বৃদ্ধির জন্য যে এসকল দরকার। নইলে লোক সংখ্যা কর্ত্তাটি মারা যাবার পর দু'চারিটি কমেছে ছাড়া আর বেড়েছে কৈ ?"

রসিক বলিল, "কিন্তু কর্ত্তার আমলেই ত সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অধিক ছিল। আমাদের বেঁচে থাকাটা কি তার চেয়ে বড় জিনিষ নয়, মা ? আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ি কোথায় বল দিকিনি ?"

মাতা আর কিছু বলিলেন না।

রসিক দেখিল, নায়েবের কাছে থাকা আর চলে না। এতদিন বাবা ছিলেন, নিজেদের জাতব্যবসা চালাইতেছিলেন। ভাইটি ছোট—সে কি এ সকল পারিয়া উঠিবে ? শ্রাদ্ধশান্তির পর সেদিন বিকালবেলায় পিতার অর্থোপার্জ্জনের অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া সে শানাইয়া দুরস্ত করিয়া রাখিল।

পরদিন প্রাতঃকালে পথে বাহির হইতেই সম্মুখে চোখে পড়িল রায়েদের প্রকাণ্ড বাড়ীটা। গ্রামের মধ্যে ইহারাই সম্পন্ন গৃহস্থ—তাহাতে আবার মনিব লোক। এই বাড়ীটায় সর্ব্ব প্রথমে গমন করা তাহার কাছে যেন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কনকের বিস্ময়জনক ব্যবহার বিষদভাবে যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার চোখের উপরে। ছেলে বেলাকার সেই শিশু সাথীটি আজ জমীদারের আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে যেন ভিটা-ছাড়া করিবার জন্য গলাধাক্কা দিতে দিতে আগাইয়া চলিয়াছে। যাই হউক এই রায়েদের বাড়ীতে সে সর্ব্বপ্রথম ঢুকিয়া পড়িল। যদি সুবিধা হয় কনকের কাছে একবার জানিয়া দেখিবে এমন ভাবে তাহাদের হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিতে তাহার ভাল লাগিতেছে কেন ?

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল, কনক মুখে সাবান মাখিয়া আয়না সম্মুখে রাখিয়া নিজেই কামাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে দ্বারের পার্শ্বে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কনক একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া মুখে আবার সাবানের তুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল। রসিক ভাবিতেছিল, একটা অতি পরিচিত জীবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া দু'জনা আবার যেন একটা নূতন পরিচয়ের স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। এখন ইহাকে কনকদা বলিয়া সম্বোধন করিলে হয়ত বড় একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

যাই হউক কনকই প্রথমতঃ কথা বলিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আয়নার উপরেই মুখ রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল,—

"রসকে যে! শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল? আমাদের মাথায় আর হাত দিতে হবে না। বাড়ীর মধ্যে যা—দেখগে কর্ত্তা যদি কামান।"

এ কর্ত্তাটি কনকের এক খুড়া মহাশয়। ইনি কর্ত্তাদের সমপর্য্যায়ে অবশ্য পড়েন—কর্ত্তৃত্ব কিন্তু ইঁহার কিছুই ছিল না।

রসিক অগত্যা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। খুড়া মহাশয় তাহার হাতে কামাইলেন। এবং ঘর সংসারের অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সেও যথাযথ উত্তর দিল। তারপর সে শুষ্কমুখে আবার আসিয়া কনকের নিকটে দাঁড়াইল। কনক জিজ্ঞাসা করিল,—

"কাকামশায় কামিয়েছেন?"

রসিক বলিল, "হাঁ।

তারপর সে সঙ্কোচভরে বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে। বাড়ী এসে দেখলাম আমাদের ভিটেটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি আপনি। দেখে আমার চোখে জল এল।"

কনক এক নজর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "ওঃ! তা চোখে জল আসারই বা কারণ কি? খাবি ত ক্ষুর চালিয়ে—বেশী জমি জমা দিয়ে করবি কি?"

রসিক হয়ত আর একটু সঙ্কোচ এড়াইয়া বলিতে পারিত, ক্ষুর ত আজকাল আপনারা নিজেরাই চালাইতেছেন। কিন্তু কথা ত সে নয় —আর একটা মনোগ্রাহী বিবরণ ছিল শৈশবের সেই সিমুলতলার অম্লান খেলাধূলা হইতে আর তাহাকে বঞ্চিত করিবার আজিকার এই বিশিষ্ট মনোভাবটি পর্য্যন্ত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আজ এত অধিক সম্পর্কের ব্যবধান যে ইহার সহিত সংঘর্ষ ও মীমাংসা—দুই-ই যেন সমান অসাধ্য। কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

তারপর সে যে বাড়ীতে গেল দু'একটি বৃদ্ধগোছের লোক ছাড়া আর কেহ তাহার কাছ দিয়া ঘেঁসিল না। সে ভাবিল,—কাজ কমিল, মন্দই বা কি, বাঁধাধরা পাওনা-গণ্ডা ত কেহ মারিতে পারিবে না।

বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে সে কাজের অবস্থা সমস্ত বলিল।

মাতা বলিলেন, "তাঁর কাছেও ও-কথা শুনেছি, হালে নাকি কি ফ্যাসান সব হয়েছে, বুড়ো মানুষ তিনি সে সমস্ত জান্‌তেন না। কিন্তু তুই ত আজকালকার ছেলে, তুই জান্‌বিনে কেন?"

রসিক বলিল,—"জান্‌ব না কেন? আমার চুলও ত সেই রকম করে ছাঁটা। জানি-না-জানি একবার জিজ্ঞাসাও ত কর্‌লে না কেউ। দাড়িতে আবার কি ফ্যাসান হ'ল? গোঁফ দুটোর অবশ্য রকম-ফের কিছু হয়েছে। আমার হ'ল জাত-ব্যবসা, আমি কি এ সকল পারিনে নাকি?"

মাতা বলিলেন, "কি জানি বাবা, জাত ব্যবসা আর থাকে না বুঝি।"

কাজ কর্ম্মের অভাবে রসিক এখন পথে পথে বিড়ি টানে—ঘুড়ি উড়ায়—তাস দাবা খেলে। আর বৃদ্ধ লোক দু'পাঁচ জনাকে কামাইতে মাঝে মাঝে গ্রামে যায়। ব্রত পার্ব্বণে যায়—আর ডাক পড়িলে যায়। এই রকমে বৎসর গেল।

বৎসরের শেষে পাওনাগণ্ডা আদায় করিতে বাহির হইলে সকলে বলিলেন,—ছেলেরা ত নিজেরাই কামায়। তোর কাজ কর্ম্ম ত সংক্ষেপ হয়ে গেছে—সে হিসেবে পাওনা গণ্ডাও ত সংক্ষেপ হবে।

রসিক বলিল,—"ব্রত পার্ব্বণ ?"

মুখ শিটকাইয়া অনেকেই বলিলেন,—"ব্রত পার্ব্বণের ত কামাই নেই। পেট চলে না তার আবার ব্রত পার্ব্বণ? এখন যা, হাতে এলে যা' দেবার দেবো।"

কেহ বলিলেন, "তোর ত ছায়া দেখতে পাওয়া যায় না। তোর বাপ বটে নাপিতের মত নাপিত ছিল। পথে পথে ঘুড়ি উড়াবি আর পয়সা আদায় করবি? নাপিত ত আর বন্ধ করতে পারি না, দেব বই কি কিছু—এখন না—এর পরে একদিন আসবি।"

রসিকের বড় বিরক্তি বোধ হইল। বাড়ী আসিয়া সে মাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। মাতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এদিকে আবার দারিদ্র্য বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলিয়া ইহাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিল। এক একদিন ভাইটির অনাহারক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া রসিকের প্রাণ দুশ্চিন্তায় ফাটিয়া পড়িত। বাড়ীর জমীটুকু থাকিলেও কলা কচু রোপন করিয়া সে দু'পয়সা আয় করিতে পারিত। এখন কি করা যায়, কাহাকে বা ধরা যায়—কে বা তাহার প্রতি নেক্-নজর দেয়। নায়েবের কাছে ফিরিয়া যাওয়া যায় কিন্তু সে অল্প বেতনে নিজের খরচ পত্র চালাইয়া বাড়ীর দিকে সাহায্য করা যায় না। এখানে কাহারও

সঙ্গে তাহার মিলামেশা নাই। অতীত জীবনের বহু দূর খুঁজিয়া ফিরিতে ফিরিতে সে মাত্র তিনটি লোককে দেখিতে পাইল। তালুকদার বংশের এই নূতন মনিব কনক, তাহার বাল্যের সুহৃদ সেই শঙ্করদা, আর কাঞ্চনলতা। ইহাদের সঙ্গে যেন একটা নাড়ীর যোগ আছে, এই রকমই ঠেকে। এ ছাড়া সংসারের লোকের কাহারও মন প্রাণের সমস্তটুকু ত সে জানে না। কিন্তু কনকদার আচরণটা মোটেই ভাল লাগে না। বড় মানুষ সে আজ—হয়ত তাই। কিন্তু শঙ্করদা ও কাঞ্চনদি? এখনও যে উৎসুক প্রাণটা ঘুরে বেড়ায় তাহাদের সঙ্গে সাথে।

সে খোঁজ লইয়া জানিল শঙ্কর কলিকাতায় ওকালতি করে। কাঞ্চনলতাও কলিকাতায় থাকে। তবে তাহার কপাল পুড়িয়া গিয়াছে। ঘরে শাশুড়ী ছাড়া আর কেহ নাই, বড় কষ্টে দিন চালাইতেছে সে। কাঞ্চনলতার ভরসা সে ছাড়িয়াই দিল। একমাত্র শঙ্করের ভরসায় সাহসে বুক বাঁধিয়া সে কলিকাতায় যাওয়াই স্থির করিল। লোকের মুখে তাহার শোনা ছিল, পয়সা উপার্জ্জনের এমন জায়গা আর নাই। সে মাতাকে রাজী করিল এবং ইহাদের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল।

কলিকাতা সে অনেকদিন দেখে নাই। কিছু পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে যখন রেলে চড়িল তখন সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির বিরাম নাই। গাড়ী এই বৃষ্টি বাদলের মধ্য দিয়া 'হু' 'হু' শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাহিরের মাঠ ঘাট প্রান্তর লোকালয় এই সকল দেখিবার জন্য প্রাণ তাহার উস্‌খুস্‌ করিতেছিল। জানালা খোলা নাই—আরোহীরা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কাচের ভিতর দিয়া কতটুকু বা দেখা যায়। কিন্তু এক একটা ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া থামে আর নানা ছাঁদের আলো ঝিকমিক করিয়া উঠে। কোনটা লাল—কোনটা নীল—কোনটা সাদা; অপরিসীম আনন্দে এবং

কৌতূহলে তাহার প্রাণ সিক্ত হইয়া উঠে। সমস্ত রাত্রিটা তাহার জাগিয়া কাটিল।

অতি প্রত্যুষেই গাড়ীখানা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে সেও নামিয়া পড়িল। বাহিরের সুদীর্ঘ প্লাটফরমটি অতিক্রম করিয়া সে আসিয়া পড়িল বড় একটা হলঘরে। চারিদিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে তাহার দৃষ্টি ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

পরে জনতার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার সেতুর উপরে আসিয়া সে আরও অধিক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এটা তৈয়ার করিল কে? লঙ্কার সেতু যে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এটাও সেই নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু হনুমান কি আজিও জীবিত আছে? একজনকে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ মশায়, এটা কে তৈরী করেছে?"

লোকটি হাসিয়া উত্তর করিল,—"বিশ্বকর্ম্মা"।

তা, সম্ভব। তিনি ত লখীন্দরের লোহার বাসরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। গঙ্গার বিপুল দেহ—তীরে নৌকা ষ্টীমার ও জাহাজের শ্রেণী—ওপারের গগণস্পর্শী সৌধরাজি বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া সে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল।

এইরূপ তন্ময় হইয়া সে চলিতেছিল। দেখিলে মনে হয় না যে তাহার চলার কিছু ত্বরা আছে। অনেকটা দূর চলার পর এবার তাহার আশ্রয়ের কথা মনে পড়িল। সে যাহাকে দেখে, শঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করে। ঠিকানার সম্বন্ধে তাহারা যে উপদেশ দেয়—সে উপদেশ মত সে সম্মুখে কতকটা আগাইয়া উঠে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না। ক্রমে যেন তাহার পায়ের জোরও কমিয়া আসিতেছিল।

আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। রসিকের মুখখানাও ততোধিক ভারি। চোখ দিয়া বর্ষা নামিতে চাহিতেছিল। সে কষ্টে আত্মদমন করিয়া

পথ চলিতেছে এমন সময় পিছন দিক হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,—"এ উল্লুক—হঠ যাও।"

রসিক বাম দিকে সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, একখানা ঘোড়ার গাড়ী গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। গালপাট্টাওয়ালা সহিসটার মিষ্ট সম্বোধনে তাহার অন্তরাত্মা জ্বালা করিয়া উঠিল, ভাবিল, রাস্তা হইতে একখানা পাথর কুড়াইয়া লইয়া মাথায় ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে লক্ষ্যের বাহির হইয়া গেল।

রসিকের পাশাপাশি এক ভদ্রব্যক্তি যাইতেছিলেন। তিনি ব্যাপারটা সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিলেন। রসিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু ও বেটা আমাকে উল্লুক বললে কেন?"

বাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—"গাড়ী চাপা পড়ছিলে যে?"

রসিক বলিল,—"সে ত জানি। ও বেটার ত সাম্‌নে চোখ ছিল। আমার বরঞ্চ পিছনে চোখ নেই।"

বাবুটি বলিলেন,—"সে সত্য কথা। কিন্তু ওটা গাড়ী ঘোড়া চলাচলের রাস্তা। মানুষে দু'পাশের দুটো উঁচু রাস্তা দিয়ে চলে। তুমি বুঝি নূতন এসেছ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বেশ সাবধানে যাবে। এই উঁচুপথ ছাড়া নীচের রাস্তা ধ'রে কখনও চলো না। যখন রাস্তা পার হবার দরকার হবে চারিদিক দেখে শুনে, যখন গাড়ী ঘোড়া ট্রাম মটর অনেক দূর পর্য্যন্ত থাকবে না তখনই পার হবে।"

রসিক পরম আপ্যায়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাদের শঙ্করবাবুকে জানেন?"

বাবুটি বলিলেন,—"শঙ্করবাবু বললে ত চিন্‌ব না। রাস্তার নাম আর বাড়ীর নম্বর বললে তোমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে দিতে পারি।"

রসিক ঠিকানা লেখা কাগজখানা তাঁহাকে দেখাইল।

বাবুটি বলিলেন,—"তাই ত? তিনি দেখি গড়পারে থাকেন। আমি ত সে পর্য্যন্ত যাব না। আমার সঙ্গে কতকটা পথ যেতে পারবে। এস তারপর দেখা যাবে।"

হ্যারিসন রোড আর কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া হঠাৎ কৃষ্ণদাস পালের ষ্টাচুটি দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাবুটিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইলেন। লোহার ঘেরার মধ্যে দাঁড়াইয়া কে যেন একজন পথিক লোককে চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিতেছে। মাথায় পাগড়ী—গায়ে আলখেল্লা—কি ভীষণ চেহারা! কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাস্তার ধারে সঙ খাড়া করেছে, এখানে বারোয়ারী নেই? সেখানে নিয়ে রাখ্‌তে পারে না? ছেলেপিলে দেখলে আঁতকে মারা পড়বে যে?"

বাবুটির এবার অত্যন্ত হাসি পাইল। দমন করিয়া বলিলেন,—"বারোয়ারীর সঙ-এ শুধু সেই ঘরখানাই আলোকিত করে—আর এঁরা সমস্ত বিশ্ব জগতকে আলোকিত করেছেন। তাই ইনি ঘরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বিস্তৃত আকাশটার নীচে আশ্রয় পেয়েছেন।"

রসিক বুঝিতে পারিল না। বাবুটি এইখানে তাহাকে পথ ঘাটের উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু সে ঐখানে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী ঘোড়ার চলাচল দেখিতে লাগিল। তারপর চলার বেলায় দেখিল, বাবুটি কোন্ পথ ধরিয়া চলিতে বলিয়া গেলেন স্মরণ নাই। সে রাস্তা পার হইয়া কলেজ-ষ্ট্রীট মার্কেটের দোকানগুলি দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। আহা! কি দোকানই খুলেছে রে! ইন্দ্রের পুরী স্বর্গ ছাড়া কলিকাতাতেও ছিল বুঝি একটা!

সে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে আর যায় কিন্তু পথের কিনারা তার হয় না। অবশেষে হতাশ হইয়া হেদুয়ার পাড়ে একখানা বেঞ্চির উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল। কাল সমস্ত রাত্রিটা জাগরণে কাটিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল বেলা তখন পাঁচটা। ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছে। ফটকের কাছে চানাচুর পয়সা দু'য়েকের কিনিয়া চিবাইতে চিবাইতে সে আবার পথ চলিতে সুরু করিল। ভাগ্যক্রমে এবার গড়্পারেরই একটী যাত্রী সে সঙ্গী পাইয়া গেল। তিনি শঙ্করের বাসাটা দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

২

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া সিঁড়ির পথেই শঙ্করের সহিত রসিকের সাক্ষাৎ হইল। শঙ্কর বলিয়া উঠিল,—

"কে-রে—রসিক যে! তুই কবে এলি? বাড়ীর সব ভাল ত? দেশ থেকে এলি নাকি রে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আমাদের বাড়ীর সব ভাল?"

"ভাল। সেই কোন্ প্রাতঃকালে গাড়ী থেকে নেমেছি—আর আপনাকে খুঁজে খুঁজে নাকাল হয়ে বেড়াচ্ছি।"

শঙ্কর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বল্ দেখি? ঠিকানা জানিস নি?"

রসিক বলিল,—"ঠিকানা ত একটা এনেছিলাম বাবু, কাজে আর লাগ্‌ল কৈ? যে আজগুবি সহর—ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও তলিয়ে যান।"

শঙ্কর হাসিল। বলিল,—"খেয়েছিস্ কি?"

"আর খাওয়া বাবু! খাওয়া আমার মাথার তালুতে উঠেছে। নিতান্তই মধুসূদন আছেন, তাই অন্ধকার না হতে আপনার দেখাটা পেয়ে গেলাম।"

শঙ্কর বলিল,—"আয়, আমার সঙ্গে আয়।" এই বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূরে একটা দোকানে ঢুকিয়া নগদ দু গণ্ডা পয়সা ব্যয় করিয়া তাহাকে কিছু জল খাওয়াইল। পুনর্ব্বার পথে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তারপর কোথায় যাবি এখন? একটা কিছু মতলব স্থির করে এসেছিস্ ত? আমি ত এই সবেমাত্র ব্যবসা আরম্ভ করেছি, এখনও বাসা খরচ উঠুতে পারি নে—দেনাই হচ্ছে।"

রসিক একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল। দেহখানা তখন মাতালের মত টলিতেছিল।

শঙ্কর বলিল,—"না ভেবে না চিন্তে এই রকম অচেনা অজানা জায়গায় এসে পড়িস্—এখন ত আর নেহাৎ ছোটটি ন'স্—দাঁড়াস কোথায় বল্‌দিকিনি?"

এ হিতোপদেশগুলি পথের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়াতে রসিকের বুকের ভিতরে কান্না উঠিয়া অন্তরটি পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে চোখের পাতা দুটি ভিজিতে দিল না। নিজের অবস্থার সম্বন্ধে ইহার কাছে আর এতটুকু বলিতে লজ্জা হইল। ময়রার দোকান হইতে খাবারগুলা পেটে ঠাসিয়া দিয়া সে যেন পথ দেখাইয়া দিতেছে। ইহার উপর গা-পড়া হইয়া আর কিছু দাবী করা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করিল,—

"এখানে কাঞ্চিদির বাসা কোথায় আপনি জানেন, শঙ্কর দা?"

শঙ্কর যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"কাঞ্চনের বাসা? এই ত কাছেই গোয়াবাগানে। যাবি নাকি সেখানে? আয় আমি দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

রসিককে সঙ্গে লইয়া সে তাহাকে কাঞ্চনের বাসার কাছে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। বলিল,—"এই বাড়ীর কড়া ধরে নাড়া দে, ওপরের তলায় তারা থাকে। আচ্ছা! আমি চল্লুম তা' হলে রসিক।"

শঙ্কর চলিয়া গেল।

কড়া ধরিয়া নাড়া দিতে যে দ্বার খুলিয়া দিল সে কাঞ্চন নিজেই। সে কলতলায় গা ধুইতেছিল। গাত্র বস্ত্র ভিজা—হাতে এবং সিঁথিতে দুর্দ্দশার চিহ্নটা সর্ব্ব প্রথমে চোখে পড়ে। দরজা খুলিয়া দিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া সে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। রসিক এক নজরেই চিনিতে পারিল। বলিল,—

"আমায় চিনতে পার্‌লে না কাঞ্চি দি?"

কাঞ্চন এক নজর দেখিয়া আবার মাথা নীচু করিল। বাস্তবিকই চিনিতে পারে নাই সে।

জীবনের কত ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল এখন রসিকের। হায়! ছেলে বেলায় তাহাদের চারিটি শিশুর প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সে যোগাযোগ—এখন বুঝি কাহারও কাছে কাহারও ঠাঁই নাই। সে বলিল,—

"আমায় চিন্‌তে পারলে না, আমি সিমুলতলার রসিক।"

উহাদের গ্রামের নামটিও সিমুলতলা ছিল।

কাঞ্চন এবার মাথার কাপড়টা অনেকখানি উপরে তুলিয়া ধরিল। চক্ষু দুটি বিস্তৃত করিয়া হাসিয়া বলিল,—"রসিক দা? ওঃ কপাল! এস—এস, উপরে এস।"

সে রসিকের কাপড়ের পুঁটলিটী কাড়িয়া লইয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। রসিকও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপরে উঠিয়া কাঞ্চন বারাণ্ডায় একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। বলিল,—"বস রসিক দা, আমি চট্ করে কাপড়খানা ছেড়ে আসি।"

অল্পক্ষণ পরে গরদের একখানা সাদা কাপড় পরিয়া আঁচলে চাবির গোছা বাঁধিতে বাঁধিতে কাছে আসিয়া সে হাসিয়া বলিল,—"আর একটুখানি সময় দিতে হবে রসিক দা। আমি একলা মানুষ, শাশুড়ী বুড়ো হয়েছেন—নড়্তে চড়্তে পারেন না। সন্ধ্যেটা জ্বেলে ঠাকুরঘরে আলো দেখিয়ে আসি। কেমন ত! লক্ষ্মীটি মনে কিছু করবে না ত?"

ইহার এই মিষ্ট মধুর ডাক মায়ের আহ্বানের মত ঐকান্তিকতায় পূর্ণ। ইহা যেমন অনির্ব্বচনীয় তেমনি প্রাণে অপ্রশমনীয় পিপাসা জাগাইয়া তুলে। রসিক এবার আর সামলাইতে পারিল না। কাপড়ের খুঁটে চক্ষু দুটি মুছিয়া ফেলিল। বলিল,—

"তুমি কাজকর্ম্ম সেরে এস দিদি, আমার জন্য তাড়াতাড়ি নেই।"

কাঞ্চন একটু পরেই একথালা খাবার আনিয়া রসিকের সম্মুখে হাজির করিল। বলিল,—"কি ভাগ্য আমার আজ তুমি আমাকে দেখ্তে এলে। গ্রামের একটা পাখীর মুখ দেখ্তেও প্রাণটা আমার কেঁদে কেঁদে ওঠে। আচ্ছা! এখন হাতমুখে জল দাও। চা টা খাও নাকি? সে সব বালাই নেই কিন্তু এ বাড়ীতে, খাও দোকান থেকে আনিয়ে দি। এই জলটুকু খাও।"

ইহার দুরদৃষ্টের হাত দুখানা আর সিঁথিটায় আর একবার নজর দিতেই রসিক এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঞ্চনও অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। বলিল,—"কাঁদ কেন? কপাল ছাড়া পথ নেই। তোমরা এমন করে কাঁদলে আমাকে কত বেশী কাঁদতে হয় জান?"

সে কি একটা কাজের ছুতা ধরিয়া উঠিয়া গেল এবং একটু বাদেই আবার চলিয়া আসিল। বলিল,—

"খাও, বেশ মানুষ ত তুমি। এখনও দেখি গালে ঠেকাওনি। চা খাও নাকি ?"

রসিক বলিল,—"না। এত খাবার এনেছ, একবার এ সকল খেয়েছি। সমস্ত দিন না খাওয়ার পর বার বার মিষ্টি খাওয়া—"

কাঞ্চন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সারাদিন খাওনি কেন ?"

রসিক বলিল,—"সকাল না হতে হাওড়া ষ্টেশনে এসে নেমেছি। তারপর তোমাদের সন্ধান করতেই সমস্ত দিনটা কেটে গেল।"

পল্লীগ্রামের এই অজ্ঞ ভ্রাতাটির জন্য ব্যথায় কাঞ্চনের মন গলিয়া পড়িল। বলিল,—"আহা! সমস্ত দিনটার মধ্যে বাসা খুঁজে পাওনি। তা হ'লে এসকল আর এখন খেও না। তোলা উনুনটা আমি এইখানেই নিয়ে আসি ; এখানে বসে বসে রাঁধি আর তোমার সঙ্গে গল্প করি—কেমন ত ?"

সে পাথরের বাটিতে করিয়া খানিকটা দই আনিয়া রসিককে খাইতে দিল। তারপর আবশ্যকীয় তোড় জোড় সমস্ত গোছাইয়া লইয়া রসিকের সম্মুখে আসিয়া রাঁধিতে বসিল।

কাঞ্চনের অবস্থার কাহিনী এখন খুবই সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। স্বামী মারা যাবার পর মানুষের মধ্যে এখন তাহার শ্বশ্রূ এবং সে। আর সম্পদের মধ্যে এই বাড়ীটা। নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে। কুড়িটা টাকা পাওয়া যায় ; তাতেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে। ঘরের ভিতরে এই রান্না খাওয়া থাকা ছাড়া বহির্জ্জগতের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক খুব কমই। বাড়ীটারও জমাট ধসিয়া গিয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মেঝেগুলার প্রায় সর্ব্বত্রই খোয়া বাহির করা ; ঝাঁটার আগায় গর্ত্তের

পরিসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। খরচার অভাবে সংস্কার হয় না। নিজের কথা উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রসিক কথাপ্রসঙ্গে কাঞ্চনের অবস্থাটা সমস্তই জানিয়া লইল। তারপর কাঞ্চন বলিল,—

"এসেছ যখন, তোমাকে হঠাৎ ছাড়ছি নে। একলাটি প্রাণ যেন সর্ব্বদা পাগল করে। নীচে ভাড়াটেরা আছে অবশ্য—আপনার জন নইলে কি বুক জুড়োয় ?"

এবার রসিকের নিজের অবস্থা জানানর পথও খুলিয়া গেল। কিন্তু কেমন কুহেলিকাময় সংসারটি। কনক দা—শঙ্করদা—আর এই কাঞ্চন। কাঞ্চন কেন তার স্বল্প পরিসর আবাসের মধ্যে মনটি ততোধিক সঙ্কীর্ণ করিতে পারে নাই। শঙ্করদা যখন পথে তুলিয়া দিতে পারিল—এ কেন দরজায় খিল আঁটিতে পারিবে না। রসিক বসিয়া বসিয়া তন্ময় হইয়া এই সকল ভাবিতেছিল। কাঞ্চন বলিল,—

"উত্তর দিচ্ছ না যে বড়, থাকবে ত এখানে কিছু দিন ?"

রসিক বলিল,—"থাক্‌ব বলেই ত এসেছি দিদি! বাবা মারা যাবার পর বড্ড হাবড়ে পড়ে গেছি। মা ভাইকে যা হোক্‌ পাল্‌তে ত হবে আমাকে।"

সে তাহার বর্ত্তমান দিনের অবস্থার কথা বেশ পরিস্ফুট ভাবে কাঞ্চনকে শুনাইয়া গেল।

কাঞ্চন বলিল,—"এসেছ, বেশ করেছ; এখানে কি কর্‌বে—জাত ব্যবসা ?"

জাত ব্যবসার উপর রসিকের ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। সে বলিল,— "একটা পান বিড়ির দোকান কর্‌ব বলে ভেবেছি।"

কাঞ্চন বলিল,—"ও সকল মতলব কোর না রসিক দা। নূতন তুমিমানুষ ম, এ বড় সোজা জায়গা নয়। বাড়ী ভাড়া, ট্যাক্স, তারপর

ব্যবসায় কি দাঁড়ায় তার নাই ঠিকানা। আমার কথা যদি শোন, দিন কতক রাস্তাঘাটগুলো চিনে নাও। তারপর পুঁজিপাটা নাই কিছু না—নিজের জাত ব্যবসা তাই কর।"

রসিক এতক্ষণ নিশ্চিন্তমনে কথা বলিয়া চলিতেছিল কিন্তু কাঞ্চনের এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া মুখখানা সহসা তার বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার এই কুণ্ঠিত ত্বরিত ভাবটুকু কাঞ্চনের লক্ষ্য এড়াইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল,—

'কি ভাবছ যেন তুমি। আমার কথা মনে ধরে নি বুঝি ?"

রসিক বলিল,—ভাব্‌ছি অনেক রকম। খাটে শুই—পালঙ্কে শুই—মূলে নেই মাদুর। পান বিড়ীর দোকান করব তারও বা পুঁজি কই ? তুমি ঠিক আমার অবস্থার মত ব্যবস্থা করেছ। কিন্তু তারও ভাববার কিছু আছে। থাকি কোথায়, খাই বা কি ?"

বিষণ্ণ মুখে কাঞ্চন রসিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধরিল। বলিল,—"ছেলেবেলায় সিমূলতলায় খেলাধূলোর মধ্যে আমাদের চারিটি শিশুর একটা বন্ধন ছিল। সে সম্বন্ধটাও ভুলে গেছ তুমি ? আমি কিন্তু ভুলিনি। তোমার দুঃখের ভাগ কতকটা আমাকে ছেড়ে দাও না রসিক দা ?"

রসিক মুখ তুলিয়া ইহার দিকে চাহিল। কাঞ্চনের পক্ষে এ ভার লওয়া এক রকম সাধ্যের অতীত রসিক জানে। সেই জানা কথাটাই জানান যায় না যে ! সে বলিল,—

"কিন্তু দিদিমণি পাপের ভাগ আর উপবাসের ভাগ সংসারের লোকে নেয়না বলেই ত জানি।"

কাঞ্চন বিষণ্ণ মুখে বলিল,—"আমি আবার আর একটা কথা জানি—আমার মত দুঃখী মেয়েদের হাতে এ সকল ভাগ ছেড়ে দিতে লোকে

আবার সময় সময় এত অতিরিক্ত বেশী কৃপা দেখায় যা' কেবল ব্যথারই সৃষ্টি করে।"

সে দেখিল, রসিকের দেহটা পদ্মের পাপড়ীর মত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে বলিল,—"তুমি কিছু ভেব না রসিক দা। সকলের উপরে এই কথাটা ভেব—আমি তোমার বোন্, আর তুমি আমার ভাই।"

কাঞ্চনের এই আমন্ত্রণ বাণী রসিকের মর্ম্মে মর্ম্মে যেন গাঁথিয়া যাইতে লাগিল।

রসিকের সঙ্গে এক গাঁয়ের মানুষ ছাড়া কাঞ্চনের এমন কিবা সম্পর্ক? কিন্তু সিমুলতলায় চারিটি শিশু-হৃদয়ের সে বন্ধনের সম্পর্কটি ত তুচ্ছ নয়।

৩

এখানকার নাপিতের মত রসিক ছোট একটি কাঠের বাক্স ও যন্ত্রপাতি কিনিয়া আনিল। কাজে বাহির হইবার আগের দিন কাঞ্চন উপদেশ দিয়া দিল,—

"সকাল সকাল উঠ; উঠেই চান করে নিও। চাদরটা ত ময়লা করে এনেছ, সাবান দাওনি কেন?"

রসিক বলিল,—"আর একটা বোচকায় আছে।"

"তাই গায়ে দিও। চুলগুলো আঁচড়ে ফিরিয়ে নিও। নোংরা সেজে যেওনা কিন্তু—পয়সা হবে না। বাবুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালবাসে।"

রসিকের সেদিন আর ঘুম হইল না। ভবিষ্যৎ জীবনের কত মধুর চিত্র তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, লোকে গিজ্ গিজ্ করিতেছে সহরটা। সারাদিন কামাইলে এই ছোট বাক্সটায় পয়সা ধরিবে ত? আর একটা বড় থলিয়া কিনিয়া লইলে ভাল হইত। দিদি ত কিছু বলিল না। যাক্, কাজ্কের দিনটা

ত দেখি ? এইরূপ রঙিন নেশায় বিভোর হইয়া কতক তন্দ্রায় কতক নিদ্রায় কতক স্বপ্নে রসিকের রাত্রি অতিবাহিত হইল।

সকালে কাঞ্চনই তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া দিল। রসিক স্নান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরিয়া চিরুণী দিয়া চুলগুলা ফিরাইয়া লইল। কাঞ্চন ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—

"সেজেছ ? বেশ ! 'দুর্গা' 'শ্রীহরি' বলে যাত্রা কর। দাড়ীতে চার পয়সা—নখে দুই—আর সেই সঙ্গে চুল হ'লে সবে মিলে আট পয়সা—বুঝলে ?"

রসিক মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল,—"নখে দুই—আর চুলেও দুই ? চুল ছাটতেই ত বেশী সময় যায়।"

কাঞ্চন ওষ্ঠ চাপিয়া হাসিল। বলিল,—"নাপিতের ব্যবসা কর্‌তে এসে রাজত্ব কিন্‌বে নাকি তুমি ? যাদের ক্ষুর চালাবে তাদের মুখের দিকে তাকাবে না বুঝি ? এক সঙ্গে সবগুলি হলে পাইকিরি দর—বুঝলে ? এখন এস !"

রসিক 'দুর্গা' 'শ্রীহরি' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নিকটে একটা বড় মেসের বাড়ী ছিল কাঞ্চন সেই বাড়ীটা রসিককে জানালা দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। রসিক সর্ব্বপ্রথমে সেই বাড়ীতে ঢুকিল ; একশো-খানেক লোকই যে বাস করে সেখানে।

তিনতলা বাড়ী। নীচের তলায় কেহ থাকে না—রান্না বান্না হয়। রসিক কতক হর্ষে কতক ভয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে আসিয়া উঠিল। উঠিয়াই দেখিল, বারান্দার সম্মুখে গম্বুজাকৃতি একটি পরিপুষ্ট বাবু মুখে সাবানের তুলি বুলাইতেছেন। সম্মুখে আয়না—পার্শ্বে ক্ষুর এবং অন্যবিধ সরঞ্জাম। এখানেও দেখি ঐ রোগ! কি মুস্কিল! সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

"বাবু কামাবেন ?"

বাবুটি নজর উপরে তুলিলেন। বলিলেন,—"ক্ষুরে ধার আছে ত তোর ? না সেই রক্ত কিন্‌কিনি ? দাড়ী ফেল্‌তে কত নিবি ?"

"আজ্ঞে চার পয়সা।"

বাবুটি বলিলেন,—"আজ্ঞে মশায়! বিদায় হোন্। চার পয়সায় এই সকাল বেলা পিত্তি রক্ষে করতে চার খানা ঘেরতো পক্ক লুচি পাওয়া যায়—সঙ্গে একটু হালুয়াও দেয়।"

তিনি ক্ষুর ঘসিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রসিক দাঁড়াইয়া রহিল। বাবুটি যখন জুলপির কাছে পোঁচ ধরিলেন তখন সে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। মেসের বাকী নিরনব্বই জনের খোঁজ লইতে তাহার আর সাহস হইল না।

পথ চলিতে চলিতে সমব্যবসায়ী দু' একটি নাপিতের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। তাহারা বেশ হর্ষোৎফুল্ল মুখে চলিয়াছে। সে পুনর্ব্বার সাহসে ভর করিয়া গৃহস্থদের ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া হাঁক ছাড়িতে লাগিল,—"বাবু কামাবেন ?"

সাড়াশব্দ নাই। কদাচিৎ উত্তর হইল, "না।" রসিকের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইতে লাগিল। বড়ই বোকা বনিয়া যাইতে হইবে দিদিমণির কাছে।

বেলা বারটার সময় একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ রসিকের উপর নজর পড়ায় বলিয়া উঠিলেন,—"দাও ত ভাই একটু কামিয়ে ?" তিনি রাস্তার একধারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"একটু চট্‌পট্ সেরে দাও—ব্যস্ত আমি।"

রসিক দাড়ী কামাইল, নখও ফেলিল। বাবু পকেট হইতে দুটি পয়সা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। রসিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তারপর পয়সা দু'টি বাক্সে ফেলিয়া বাক্সটি সে কপালে ঠেকাইল। কিন্তু সেদিন ভাগ্যদেবতা আর কিছুই মাপাইলেন না। সে শুষ্কমুখে দিদিমণির কাছে ফিরিয়া আসিল।

কাঞ্চন জিজ্ঞসা করিল,—"কত পেলে?"

রসিক মাথা নত করিয়া বলিল,—"দু' পয়সা।"

কাঞ্চন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কলকাতা সহরে বাক্স ঘাড়ে করে দু' পয়সা? পেটে দেবে কি? দু পয়সায় কি খাবে?"

রসিকের মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। ছেলেবেলাকার সে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পরিণতি কনকদার সঙ্গে যেমন—শঙ্করদার সঙ্গে যেমন—দিদিমণির সঙ্গেও ঠিক তেমনি তেমনি ঠেকিতেছে। সে ফোঁস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল,—"চান করবে নাকি আবার?"

রসিক বলিল,—"চান না করলে বার জাত ঘেঁটে এসে ভাত তলাবে কেন?"

কাঞ্চন হাসি চাপিয়া বলিল,—"পয়সা ত মাত্র দুটি—জাত ঘাঁটিলে বারটা? তা বেশ, চানই করে এস। ভাত বাড়া আছে।"

যাই হোক রসিকের রোজগার উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। পরদিন দু আনা—তার পরদিন দশ পয়সা সে পাইল। বেলা বারটা অবধি সে কামায়, বিকালে সহর দেখিয়া বেড়ায়।

কিন্তু কাঞ্চনের মনে স্বস্তি হয় না। মা ভাইকে ছাড়িয়া আসিল এতটা দূরদেশে, তার রোজগার পত্রের শ্রী দেখ। বাড়ীতে ওদিকে সব হাঁড়ি চড়াইয়া বসিয়া আছে। সেদিন অনেক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প গুজবের পর রসিককে সে বলিল, "ঘাবড়ে যেওনা যেন রসিক দা। একদিনে রাজা হওয়া যায় না। বাড়ীতে বুড়ো মাকে ছেড়ে এসেছ—ভাইটিকে ছেড়ে

এসেছ—তাদের ভাবনাটা সর্ব্বদা মনে রেখ। দর দস্তুর বরঞ্চ একটু কমিয়ে দাও। আচ্ছা! কাল আমি গঙ্গাস্নানে যাব, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সেখানে ঘাটের পাড়ে অনেক নাপিত বসে বসে কামায়। হাতের কামাই নেই ত তাদের দেখতে পাই।”

রসিক তন্ময় হইয়া গেল। পরের দুঃখে সমস্ত প্রাণটা ঢালিয়া দিতে এমন আর সে কাহাকেও দেখে নাই। কাঞ্চন তাহাকে পরদিন গঙ্গার ঘাটে বসাইয়া দিয়া আসিল।

রসিক সেদিন অনেকগুলি লোককে কামাইল। কিন্তু সবই মুটে আর মজুর। দাড়ী ফেলিতে ত সে নাক শিট্‌কায়—নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে। কদাচিৎ দু’একটি বাবুলোক হাতে পাইয়া সে কিছু শান্তি পায়।

যাই হোক বেলা বারটা অবধি খাটিয়া সে গুণিয়া দেখিল,—চৌদ্দ আনার পয়সা হইয়াছে। মুখমণ্ডল তাহার হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঘাটের পাড়ে বাক্স রাখিয়া সে বেশ মনের আনন্দে স্নান করিল। মা গঙ্গাকে স্তব-স্তুতি ও নমস্কার করিয়া ঘাটের পাড়ে আসিয়া ঠাকুর-মশায়ের নিকটে সমস্ত অঙ্গে চন্দনের ছাপ লইল। তারপর হৃষ্টমনে সে বাসায় ফিরিল।

কাঞ্চন দেখিয়া হাসিয়া বলিল—“বাঃ! গৌরাঙ্গ সেজেছ যে! কত পেলে আজ?”

হাসিতে গিয়া রসিকের ওষ্ঠদুখানা একবার বুজে একবার মেলে। সম্বরণ করিয়া সে বলিল,—“চৌদ্দ আনা।”

কাঞ্চন মনে মনে ভাবিল,—হাজার হোক নাপিতের ছেলে ত? প্রথম দু’একদিন ভেচকে গিয়েছিল। বলিল—

“বিড়ি ফুঁকুলে কতর?”

রসিক বলিল,—“বেশী না—এক পয়সার। একটা সিগরেটের

বাক্স কিনেছি আট পয়সা—পান দু'পয়সা—ছোলা ভাজাও এক পয়সার খেয়েছি। আর ফোটা কাটতে ঠাকুর মশায়রা নিলেন চার পয়সা।"

কাঞ্চন চক্ষু দুটি কুঁচকাইয়া বলিল,—"পান—বিড়ি—সিগারেট—ছোলাভাজা—তার উপর ফোটা? শুঁড়ির দোকানটা আর বাদ রেখেছ কেন? দিনকতক বাদে সোনাগাছিও যেও। চৌদ্দ আনার চার-চার আনা বাজে ব্যয় করে এলে? দাও—পয়সাগুলো আমার কাছে দাও।"

রসিক বাক্স হইতে পয়সা ঢালিতে ঢালিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"সোনাগাছি কোথায়? সেখানে কারা থাকেন?"

কাঞ্চন হাসিয়া বলিল,—"তোমার শাশুড়ীরা থাকেন। বিড়িতে পোষাল না—সিগারেট! সকালবেলা খালি পেটে দু'দু পয়সার পান? রাজা নবকৃষ্ট আর কি? আজ ত গঙ্গাস্নান হয়েছে। যাও ভাত গরম আছে।"

রসিক খাইতে গেল।

৪

গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ক্রমে সে একটাকা—পাঁচসিকা—দেড়টাকা—দুটাকা পর্য্যন্ত লইয়া ঘরে ফিরিতে লাগিল। বাড়ীতে খরচ পত্রের জন্য মাসে মাসে কিছু পাঠায়, বাকীটা কাঞ্চনের হাতে জমা হয়। এইরূপে অনেকগুলি টাকা সঞ্চিত হইলে সে একদিন কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"যারা দোকান ঘর ভাড়া নেয় তাদের কি সেলামী লাগে দিদিমণি?"

"কোথাও লাগে—কোথাও লাগে না।"

"কি রকম সেলামী?"

"তার কিছু ঠিক আছে? জায়গা বিশেষে দর। এত কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ—মতলব আছে যেন!"

রসিক হাসিয়া বলিল,—"গরীব মানুষ আমি—মতলব আর কি? তবে হাঁ, মতলব একটা আছে। এদিকে আয় ত বড় কমই হচ্ছে। ভাবছি কি বিকেল বেলাটা বসে বসে না কাটিয়ে একটা জায়গা দেখে সরবৎ আর পানবিড়ি নিয়ে বসি।"

কাঞ্চন দেখিল, একশত টাকা আয়েও রসিকের আর পোষাইতেছে না। টাকার নেশা এইরকমই বটে! সে বলিল,—

"সরবৎ তৈরী করতে শিখেছ?"

"হাঁ, আমার এক বন্ধু হয়েছে যে! সে একজন সরবতওয়ালা। কোথায় সিরাপ কেনে—কোথায় বরফ—কি করে তৈরী করে, সবই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।"

"তা বেশ ত। আমাদের এই বাড়ীর নীচে রকের উপরেই খুলে বস—ভাড়া লাগবে না।"

রসিক বলিল,—"জায়গাটা বড় এঁদো। বড় রাস্তার উপর একটু সাজসজ্জা করে বসলে হ'ত না?"

কাঞ্চন দেখিল,—এত লম্বা লম্বা কথা বলিতেছে এ সেই নাপিতের ছেলে—যে প্রথম দিন দু'পয়সা পাইয়া হতাশ হয় নাই—আর রণে ভঙ্গ দেয় নাই। সে বলিল,—

"তাতে দরকার নাই। আমার চোখের উপর থাকলে অনেক রকমের সুবিধা আছে। দু'পয়সা আয় না হয় কমই হবে। সেই ভাল।"

এই বয়স—হাতে কাঁচা পয়সা—নূতন আসিয়াছে কলিকাতায়—কাঞ্চন তাহাকে চোখে চোখে রাখিতে চায়।

রসিক রকের উপর একখানা টিনের চালা দিয়া লইল। পানের সজ্জার জন্য পিতলের বাক্স—খাগড়ার থালা—বড় আয়না প্রভৃতি কিনিল।

মিস্ত্রি ডাকিয়া বিড়ি সিগারেট রাখার কাঠের ফ্রেম তৈরী করাইল। সরবতের সজ্জা—বিদ্যুতের আলো—দেবদেবীর ছবি—সকলে মিলিয়া ঘরখানা বেশ দৃশ্যসই হইয়া উঠিল। কাঞ্চন সমঝাইয়া দিল,—

"সব জায়গায় নাপতে বুদ্ধি খাটে না, বুঝলে রসিক দা? লোক ঠকিও না যেন! একটা বৃদ্ধ লোককে যা দেবে—কাঁচাছেলেটিকেও সেই দরে তাই দিও।"

রসিক এখন সকালে বেলা বারটা অবধি কামায়। গঙ্গার ঘাটে আর সে বসে না। পাড়ায় অনেকগুলি ঘর সে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। খাওয়া দাওয়ার পর সে সরবতের দোকান খুলিয়া বসে ও রাত্রি এগারটা অবধি বিক্রয় করে। দোকানে কতকগুলি বেতনভোগী ছোক্‌রা নিয়ত খাটে। সকালে সে যখন কাজে বাহির হয় তাহারা তখন বিড়ি তৈয়ার করে। এইরূপে দুই দিক হইতে রসিকের আয় বেশ বাড়িয়া উঠিল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কাঞ্চন একদিন বলিল,—

"এত টাকা, আমি মেয়ে লোক, আমার হাতে এনে জমাচ্ছ—শেষটা হিসাবপত্রে গোলমাল ঘটে বস্‌বে কোন দিন। এক কাজ কর—টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে রাখ। এত টাকা পয়সা হাতে রাখাও ভাল নয়।"

রসিক প্রথমে আপত্তি তুলিল। কাঞ্চন শুনিল না। সে খরচ পত্রের একটা বাঁধাধরা শৃঙ্খলার ভিতরে তাহাকে আনিয়া ফেলিল। মাসে মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা সে বাড়ী পাঠায়। এখানকার আবশ্যকীয় খরচ পত্র করে। বাকী টাকা সে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। কাঞ্চন কিন্তু তাহার উন্নতির দিনেও খাই খরচা বা বাড়ীভাড়ার বাবদে কিছু নিতে রাজী হয় না।

ইতিমধ্যে কাঞ্চন তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ইচ্ছামতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একবার শ্রীক্ষেত্রে গেল। এবং প্রায় ছ'মাস কাটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া

আসিল। আসিয়া দেখে তাহার বাড়ীখানার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। বাড়ীটার ভিতর বাহির জমাট ধরাইয়া রং করা হইয়াছে। সাবেকের কালের ছোট ছোট দরজা জানালা বদলাইয়া বড় বড় দরজা জানালা বসান হইয়াছে। বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো ছিল না—তাহাও ফিট করা হইয়াছে। মেঝেগুলোও আগাগোড়া খুঁড়িয়া লাল সিমেণ্টের রং করা হইয়াছে। কাঞ্চন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"এ সকল কি রসিক দা?"

রসিক তাহার পায়ের উপর গড় হইয়া বলিল,—"খাও আর না খাও থাকার জায়গাটা ভাল চাই দিদিমণি! আর তুমিই ত আমাকে শিখিয়েছ যে,—তুমি আমার বোন্—আর আমি তোমার ভাই, সকলের উপরে এই কথাটি স্থান দিতে। বোনে যদি আজীবন তার ভাইটির দেহ রাখার ব্যয় টেনে বয়ে চলতে পারে—বোনের বাড়ীটা কেন ভায়ে মেরামত করতে পারবে না!"

কাঞ্চনের চক্ষু দুটি চকিতে উজ্জ্বল হইয়া মমতায় ও ব্যথায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিল।

———

মাতৃঋণ

"হাঁা, বৌ মা, এমন ভালছেলে ব্রজেন, তার নামে এ সকল কি কথা শুনি ?"

অপর ঘাট হইতে ঘোষ গৃহিণী এই পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

রক্ষা যে ঘাটে আর কেহ নাই। ভয়ে সিদ্ধেশ্বরীর দেহের শোণিত-ধারা শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি-তখনি তাঁহার মনে ভরসা হইল যে জ্যেঠাইমা বুঝি অন্য কোন্ ব্রজেনের কথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যেঠাই মা আমাকে কিছু বল্‌লেন ?"

ঘোষ গৃহিণী বলিলেন, "হাঁ মা, ব্রজেনের কথাই বল্‌ছিলাম। কাল মদ খেয়ে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত রাত্তিরটা বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। এমন ছেলে ব্রজেন, চোখে দেখলেও যে পেত্যয় হয় না।"

সিদ্ধেশ্বরী স্বভাবে যেমন নম্র তেমনি তেজস্বী। যাহা অবিশ্বাস্য তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেও ত পারা যায় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি দেখেছেন কি তাকে মদ খেতে ?"

ঘোষ গৃহিণী বলিলেন, "আমাকে দেখিয়ে কি আর খেয়েছে—না খেতে পারে ? মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে এল, আমার বদ্দিনাথই ত তাকে শুইয়ে রেখে সুস্থ করে তুল্‌লে।"

সিদ্ধেশ্বরীর হিম-শীতল দেহখানি কাঁপিতে লাগিল। সন্তানের মধ্যে তাঁর ঐ একটিমাত্র ছেলে। সংসারের মধ্যেও পুত্রবধূ আর সে। পুত্র ও পুত্রবধূ দুইই তাঁহার প্রাণের অধিক। ব্রজেন্দ্র কোনদিন মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা বলে নাই। এমন ছেলে কি কোনদিন দাগা দিতে পারে ?

ব্রজেন কাল রাত্রে বাড়ী আসে নাই। বলিয়াছিল কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। জ্যেঠাইমার কথা কি তবে সত্য? তিনি বাদপ্রতিবাদ না করিয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের কাজ সারিয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন।

পুত্রবধূ হিরণ্ময়ী তখন ঘর নিকাইতেছিল। শ্বশ্রূর মূর্ত্তি দেখিয়া গোবরের নেতার উপর হাত চাপিয়া রাখিয়া একান্ত বিস্ময়ে সেই মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। একি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি লইয়া ঘাট হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন? সে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না।

সিদ্ধেশ্বরী কতকটা সংযত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা, ব্রজেন কাল রাতে বাড়ী আসেনি?"

হিরণ্ময়ী এতক্ষণে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মনঃপীড়ার কারণ কতকটা বুঝিতে পারিল। কিন্তু কিছুদিন হইতে মুখের দুর্গন্ধে সে যে স্বামীর একটা ব্যভিচারের খবর অনুভবে পাইতেছিল, মাতার কর্ণে কি সেটা জ্বলন্ত হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে? সে ভয়ে ভয়ে শুষ্কমুখে কহিল—

"না।"

"সারা রাতই কি তার নিমন্ত্রণ খেতে গেল? সোমত্ত বউ তুমি ঘরে রয়েছ—সে নিশুতি রাতে বাইরে বাইরে থাকে কেন?"

ইহার প্রত্যুত্তর হিরণ্ময়ী কি দিবে? গ্লানিতে অবসন্ন দেহে হাত পা ছাড়িয়া সে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

সিদ্ধেশ্বরী পুত্রবধূর অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেলেন, "তাকে তোমার দেখা উচিত।"

সকাল বেলাকার গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়া যখন রান্নার উদ্যোগ চলিতেছিল, সেই সময় ব্রজেন্দ্র বাড়ী আসিল। নেশা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। পুনর্ব্বার ঐ হেয় সামগ্রী গলাধঃকরণ করিবার জন্য প্রাণে একটা উন্মাদনা

জাগিতে ছিল। পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল, হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে কিছু টাকা পয়সা চাহিয়া লইবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই সর্ব্বপ্রথমে মাতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন অন্তরে গোপন করিয়া সিদ্ধেশ্বরী নীরবে কাজ করিয়া চলিতেছিলেন। ব্রজেন্দ্র মনে করিল সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তাই কোন দ্বিধা না করিয়া মায়ের নিকটেই টাকা প্রার্থনা করিল।

চোখ মুখের চেহারা তখনও স্বাভাবিক হয় নাই। মুখ হইতে যেন একটা বিকট গন্ধ ছুটিয়া আসিল সিদ্ধেশ্বরী অনুভব করিলেন। হাতে তেলের পাত্র ছিল, সেটী মেঝের উপর রাখিয়া তিনি খাটের উপর যাইয়া পা তুলিয়া বসিলেন। স্বর কিছু উচ্চ করিয়া ডাকিলেন,

"বৌ মা!"

হিরণ্ময়ী রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া নতমুখে শ্বশ্রূর নিকটে দণ্ডায়মান হইল। সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন,

"আজ থেকে ব্রজেনের মা বলে আমাকে কেহ না ডাকে সেই জন্যে তোমাকে ডেকেছি। ঘাটে ওর কুকীর্ত্তির কথা বিশ্বাস করতে পারিনি; এমনি অপদার্থ যে মাতাল হয়ে আমার কাছে এসে হাত পেতে টাকা চাচ্ছে। এ গৃহে সিদ্ধেশ্বরীর ছেলের স্থান হতে পারে—কুলাঙ্গারের স্থান নাই। তুমি আমার প্রিয়, তাই তোমাকে ডেকে বল্লাম।"

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ী এই তেজস্বিনী নারীকে চিনিত। যে পুত্রকে তিনি চোখের আড়াল করিয়া স্বস্তি পান না—কাছে পাইলে যাহার প্রতি অনুরাগের পুণ্যকণা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে—তাহার প্রতি জননীর এই কঠোর আদেশ শুনিয়া সে যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি ভীতও হইল। দেওয়ালের গাত্রে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সে কোনক্রমে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজেন ইতিমধ্যে কোন্ সময় ঘর হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "কাল রাতে নিমন্ত্রণ ছিল—মিথ্যে কথা। হয়ত সারারাত কিছু খায়নি। এবেলাটার মত ওকে দুটো ভাত দিও—যাও।"

শ্বশ্রূর অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে প্রস্থান করিল।

২

হিরণ্ময়ীর অন্তরে বিচিত্র রকমের একটা ঝড় বহিতেছিল। রান্নাঘরে রাঁধিতে বসিয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। এমন স্বামী, এমন শ্বশ্রূ লইয়া ঘর করিবার কল্পনায় সে যে নিত্য নূতন নূতন স্বপ্ন দেখিত। নিমিষের মধ্যে একি বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবারও যে উপায় রহিল না। গৃহের কাজকর্ম্মগুলি তাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু সে করিল কি অপরে করিল সে ধারণা সে নিজেই করিতে পারিতেছিল না। সারাদিন অস্বস্তিতে কাটাইয়া সে আপনাকে স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু যখন দিনের আলো ফুরাইয়া গেল তখন মায়ের আদেশ বাক্যটি তাহার নিকটে আবার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিল। গড় হইয়া প্রণাম করিবার বেলায় কি একটা প্রার্থনা জানাইবে স্থির ছিল, সে ভুলিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি আহ্নিক করিতেছেন। সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। আহ্নিক শেষ হইলে ঘোমটাটা অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বেশী মাত্রায় টানিয়া দিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল,—

"মা!"

সিদ্ধেশ্বরী চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "কে—বৌ মা?"

তিনি সেই আসনেই পুত্রবধূর দিকে ফিরিয়া বসিলেন। কিন্তু ইহার প্রাণে যে জ্বালা ধরিয়াছে সে-মুখে এইটুকুই প্রকাশ পাইলমাত্র। সে আর কিছু প্রশ্ন করিল না। সিদ্ধেশ্বরী ইহা লক্ষ্য করিলেন। বধূর মুখের উপর স্নিগ্ধ চক্ষুদুটি স্থাপিত করিয়া তিনি ব্যথিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আমি কি তার পাপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারি?"

এ প্রশ্নের উত্তরে হিরণ্ময়ীর ঘাড়টি শুধু আর একটু হেঁট হইয়া পড়িল। সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন,

"নেশার পাপ আমার মুখের তাড়নায় শুধরে যাবে এ বিশ্বাস আমি করিনা। ও যদি এসে আমার পা ছুঁয়ে শপথ করে তবুও বিশ্বাস করা যায় না, বৌমা।"

হিরণ্ময়ী নীরব হইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "চোখের অন্তরাল হলেও লোকে আমাকে বলতে ছাড়বে না। কিন্তু তখন মনে করবার একটু এই সুবিধা পাব যে, ব্রজেনই নেশা করে, পাপ করে, আমার ছেলে করে না।"

হিরণ্ময়ী নিশ্চল নিস্পন্দ। চক্ষুদুটী দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা দেখিলেন। বলিলেন,

"মায়ের ঋণ কি দিয়ে পরিশোধ করছে দেখ। কাকেও মুখ উঁচু করে কথা বলি, সে তেজ রাখেনি। মায়ে কি সন্তানের কাছে এই চায়?" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি ওকে আশীর্ব্বাদ করি—ও যেন ঋণ শোধ করবার শক্তি পায়। তখন হয়ত আমি ক্ষমা করতে পারব।"

অদূরে গৃহদেবতার মন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি সাগরের মৃদু কল্লোলের মত ব্যথাপ্ল সুরে ভাসিয়া আসিতেছিল।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, "আজ আমি যদি তাকে ক্ষমা করি, তার কু-চরিত্রটা ধূলো বালি চাপা দিয়ে চেপে রাখা হবে। তুমি তার সাধ্বী স্ত্রী—তুমি কি তাই চাও? চাইলেও তোমার মা আমি—আমি কি তাই দিতে পারি?"

সিদ্ধেশ্বরী এই নিরপরাধ বধূটীর ম্লান মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু উপায় কিছুই ছিল না। তিনি কিছু সময় ভাবিয়া বলিলেন,

"নেশার কড়ি আর সেই সঙ্গে ভাতের কড়ি অপরে যদি যুগিয়ে চলে, তাকে দাঁড় করাবে কিসে?" একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি যখন এসেছ তখন তোমরা আমাদের বাগান বাড়ীতে যেয়ে থাক—এই পর্য্যন্ত অনুমতি আমি তোমাকে দিতে পারি। তার বেশী একটা আধলা পয়সার সাহায্য আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

হিরণ্ময়ী একান্ত বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিল। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,

"আমরা—?"

"হাঁ মা! তুমি তার পত্নী। তোমার কি তাকে ছেড়ে থাকা উচিত এ সময়? যেমনই হোক স্বামীর বাড়া নারীর সংসারে আর কিছুই নাই। আমার সুখ সুবিধার স্বার্থে তোমাকে কেন আটক করব? ঘরে থেকে রাজ্যভোগেও তুমি সুখী হতে পারবে না, মা!" একটু পরে বলিলেন, "আমার ক্রোধ আছে, তোমার ক্রোধ নাই—তোমার ভরসাই আমি অধিক করি।"

সিদ্ধেশ্বরী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন দেখিয়া হিরণ্ময়ী তাঁহার পিছু পিছু ঘরের বাহির হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

রাত্রির বেলা উনুন জ্বালিবার প্রয়োজন হয় নাই। খাইবে কে?

শাশুড়ী সে বেলার মতই সে গৃহের অন্ন স্বামীর পাতে দিতে বলিয়াছিলেন। ব্রজেন খাইতে চাহিয়াছিল, হিরণ্ময়ী বলিয়াছিল, "একটা বেলা এস পারণ করে কাটাই না। আমার শরীর ভাল নেই, আমি আজ আর পেরে উঠছি না, লক্ষ্মীটী!"

রাত্রি তখনও ভোর হয় নাই। সেই সময় সে ব্রজেনকে জাগাইয়া তুলিল। পালঙ্ক হইতে নামিয়া সে বলিল,

"আমার সঙ্গে এস।"

ব্রজেন তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে কহিল, "কোথায়?"

"দেখ্‌বে এস।"

তাহারা উভয়ে যখন সেই অন্ধকার রাত্রে পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন হিরণ্ময়ী কহিল,

"আমি ত পথ চিনি না। বাগান বাড়ীতে যেতে হবে, পথ দেখিয়ে চল। এখন কিছু জিজ্ঞাসা কোর না, সেখানে সব বল্‌ব।"

বাগানবাড়ী গ্রামের প্রান্তভাগে—এক মাইলের কিছু কম পথ, নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রজেন যন্ত্র চালিতের মত চলিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী তাহার হাত ধরিয়া পাশাপাশি চলিল। সুখের কত কোমল স্মৃতি এই সিদ্ধেশ্বরী মায়ের সঙ্গে তাহাদের জড়িত ছিল। হিরণ্ময়ীর চক্ষু দুটি দিয়া অন্যের অলক্ষ্যে সাবধানে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। শ্বশ্রূকে জাগাইয়া তুলিয়া বিদায়ের একটা তীব্র করুণ দৃশ্য প্রকট করিয়া তুলিবার তাহার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু গৃহ ত্যাগের সময়—তাঁহার উদ্দেশ্যে মনে মনে সে প্রার্থনা জানাইয়াছিল যে,—"মা! তোমার আশীর্ব্বাদই যেন সফল হয়।"

বাগান বাড়ীতে উপস্থিত হইলে স্বামীকে সে কহিল, "মা আমাদের জন্য এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি কিছু অবিচার করেন নাই

—তুমিই অপরাধ করেছ। ভাল রকম বুঝে সুঝে না দেখে তাঁর প্রতি মন বিরুদ্ধ কোর না। আর একটা অনুরোধ করবার আছে—সে আমি তোমাকে ধীরে সুস্থে বল্‌ব।"

ব্রজেনরা বেশ অবস্থাপন্ন লোক। শৈশবে সে পিতৃহীন হয়। মাতাকে সে দেবতার মতই জ্ঞান করিত। তার স্বভাব চরিত্র বেশ পবিত্রই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া দিন কতক দেশ ভ্রমণের জন্য তাহার খেয়াল হইল। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব ক'একটী জুটিলেন। তন্মধ্যে দু'একটী পানাসক্তও ছিলেন। এই দলে বিস্তৃতভাবে ভিড়িয়া সে আপনাকে নষ্ট করিয়া বসিল। মধ্যে মধ্যে হিরণ্ময়ীর সন্দেহ হইত। মায়ের কাছে সে বেশ লুকাইতে পারিত।

বাগান বাড়ীতে আসিয়া ব্রজেনও যেন বাঁচিল। সংসারে স্নেহ পাইবার তাহার একটিমাত্র স্থান ছিল। পরিণত বয়সেও শিশুর মত ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়া মাতার নিকট হইতে সে আদর কাড়িয়া লইত। সেই জননীর ললাটে অসীম লজ্জার কলঙ্ক-টীকা পরাইয়া দিয়া কক্ষভ্রষ্ট ধূমকেতুর মত সহসা সে যে ইহার দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী হইতে পারিল, এ ভালই হইল। মাতার আদেশের কঠোরতা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবার তাহার আর উৎসাহ থাকিল না।

বেলা বাড়িলে হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "খাবে কি?"

ব্রজেন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "মায়ের কাছে আমি ত যেতে পারব না। তুমি বরঞ্চ মালীদের কাকেও পাঠানর ব্যবস্থা কর।"

হিরণ্ময়ী বলিল, "আমার লজ্জা করে।"

সে তাহার হাতের একগাছা বালা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "উপস্থিত এই বেচে হ'ক, বন্ধক দিয়ে হ'ক, যা' যা' দরকার নিয়ে এস। কিন্তু আমায় ছুঁয়ে বল, একটী পয়সাও এর অপব্যয় কর্‌বে না?"

ব্রজেন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না।" স্ত্রীর একথা সে রাখিল। কিন্তু বেশীদিন রাখিতে পারিল না। কুসঙ্গীদের জালে সে আবার জড়াইয়া পড়িল। হিরণ্ময়ীর অঙ্গের এক একখানি গহনায় সংসার এবং অপব্যয় দুইই সে চালাইতে লাগিল। ক্রমে হিরণ্ময়ীর অঙ্গের অলঙ্কার নিঃশেষ হইয়া আসিল। একদিন সে স্বামীর হাত দুখানা সকাতরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,

"মায়ের চোখের জল টেনে বের করেছ—আমারও কর্‌লে—পেটে একটা হয়েছে তারও করবে? আর ত কিছু নেই, এখনও ভাল হও।"

ইদানীং ইহাদের খাওয়া পরার কষ্ট চলিতেছিল। হিরণ্ময়ী সন্তানবতী হইবার পর তাহার দেহের লাবণ্য দিন কতক কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়া খাদ্যের অভাবে চিন্তায় চিন্তায় আবার তাহা শুকাইয়া উঠিতেছিল। একদিন ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি দিন দিন দেখি শুকিয়ে যাচ্ছ?"

হিরণ্ময়ী অল্প হাসিয়া কহিল, "পেটে যেটা রয়েছে সেইটের কথাই বল। আর তোমার হুঁস কবে হবে?"

ব্রজেন চুপ করিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিল, স্বামীর মুখে প্রতিজ্ঞার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে।

৩

শুধু অর্থকৃচ্ছ্রতায় নয়—শুধু হিরণ্ময়ীর কাতর তাড়নার জন্যও নয়—মদ্য আর সে স্পর্শ করিবে না এইরূপ একটা সঙ্কল্প মাঝে মাঝে ব্রজেনের মনে উঠিত। শৈশবে সে পিতৃহীন হইয়াছিল, মাতার স্নেহের প্রভাব তাহার উপর সামান্য ছিল না। মাতাকে সে ভয়ও করিত। আবার তাহার আনন্দ ও সাহস সেই বক্ষেই ছিল। পুত্রের পদস্খলন জননী যেমন সহ্য করিতে পারিলেন না—সেই মাতার বিচ্ছেদ যাতনা পুত্রও

সেইরূপ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে হিরণ্ময়ীকে না জানাইয়া মাতার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে একদিন গভীর রাত্রে সিদ্ধেশ্বরীর শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। গরমের জন্য সিদ্ধেশ্বরী বাহিরের খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ব্রজেন দেখিল, মাতা গভীর সুপ্তিমগ্ন। ললাটে চিন্তা-রেখা। নিদ্রিত হইয়াও বুকের বিস্তৃত ব্যথা বোধ করি তিনি জুড়াইতে পারেন নাই। ব্রজেন সেই বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে অনিমিষে চাহিয়া থাকিয়া বসিয়া বসিয়া আহত হইতে লাগিল। এক একবার তাহার দেহখানা নড়িয়া চড়িয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে চাহিতেছিল যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়া জননীর বুকের ক্ষত সে মিলাইয়া দেয়। এই সময় সিদ্ধেশ্বরী স্বপ্ন দেখিয়া ঘুমঘোরে বলিয়া উঠিলেন,—"বৌ মা! কলঙ্ক দিয়ে যে বংশগৌরব নষ্ট করলে মায়া দিয়ে আবার আমি তাকে নষ্ট করব? সে আমি পারব না, মা, তুমি সতী লক্ষ্মী, আমাকে নিষ্ঠুর ভেবনা।"

মুখে তেমনি অবিচলিত নিষ্ঠা—ললাটে তেমনি একান্ত দৃঢ়তা।

ব্রজেন কম্পিত পদে টলিতে টলিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। নীরব রাত্রির চঞ্চল বায়ু তীরের মত গায়ে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। সে আর কোথাও অপেক্ষা না করিয়া ক্লান্ত ও শ্লথ গতিতে হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, আঁতুড় ঘরের প্রদীপটী মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। হিরণ্ময়ী নবকুমারের শিওরে বসিয়া শিশুটির ললাটের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

সেদিন ষষ্ঠরাত্রি। বিধাতাপুরুষ শিশুর ললাটে ভাগ্যলিপি লিখিবেন। হিরণ্ময়ী স্বামীকে সকাল সকাল ফিরিতে বলিয়া দিয়াছিল। মেয়েদের সংস্কার এদিন একটু সাবধানে থাকিতে হয়। রাত্রি বাড়িতেছে—স্বামী এখনও ফিরিলেন না—তাহার ভয় হইতেছিল! এমন সময় ব্রজেনের পদশব্দে বুকে বল পাইয়া সে ফিরিয়া বসিল। বলিল,

"এসেছ? এই আঁতুড় ঘরেই আমার কাছে এসে বস। আমার বড় ভয় কচ্ছে। শেষে কাপড় চোপড় ছেড়ে শুদ্ধ হয়ো।"

ব্রজেন তাহার নিকটে যাইয়া বসিল।

হিরণ্ময়ী বলিল, "বস। এত রাত করে এলে? রাত্রিকালে বাইরে তোমার এত কি কাজ আমাকে বল্‌বেওনা—ঘর ছেড়ে যেতেও ছাড়্‌বে না। আজ যে আমাকে একলা থাক্‌তে নেই।"

ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিছু খেয়েছ?"

হিরণ্ময়ী চুপ করিয়া রহিল।

সে সূতিকাঘরে যাওয়ার পর ব্রজেনই রাঁধিতেছিল। যাহা সে রাঁধিত কোনদিন মুখে দেওয়া চলিত—কোনদিন বা চলিত না। সেদিন কিছু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া সূতিকাঘরে রাখিয়া দিয়া সে ঘরের বাহির হইয়াছিল। সে যখন সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া রান্নার ব্যবস্থা করিল না—তখন সেই বা তাহা কি করিয়া মুখে দেয়। সে দুগ্ধ তেমনই ধরা ছিল। হিরন্ময়ী কহিল,

"একটা কথা বল্‌ব?"

"বল।"

হিরণ্ময়ী বলিল, "আজ বিধাতাপুরুষ খোকনের ললাটে ভাগ্যলিপি লিখ্‌বেন। কি জানি কেমন লিখ্‌বেন। যত পাপ আমরাই করেছি। এর ত কোন পাপ নেই। লিখ্‌বার আগে এস আমরা শুদ্ধ হয়ে বসি। আর খোকনের মাথায় হাত রেখে ভবিষ্যতের জন্য একটা প্রতিজ্ঞা করি। খোকনের মুখ চেয়ে এস এটুকু আমরা করে রাখি।"

হিরণ্ময়ী নবজাত শিশুটির গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল। ব্রজেন কোনদিন চাহিয়া দেখে নাই। ইহার কান্নার স্বরে সময় সময় বিরক্ত হইত। আজ চাহিয়া দেখিল ঠিক যেন তাহারই দেহের প্রতিচ্ছবি।

মুখে মৃদু মৃদু হাসি। বর্ণচ্ছটায় সূতিকাগৃহটি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। দেহের মত অনুরূপ দেহ যে পাইল, সে হয়ত জীবনেরও পথটী অনুসরণ করিয়া ক্রমবিকাশের পথ খুঁজিবে। সে ব্যস্তভাবে দক্ষিণ হস্তখানি শিশুটির মস্তকের উপর স্থাপিত করিল। বলিল,

"হিরণ, তুমি যে প্রতিজ্ঞার কথা বল্‌লে আমি তা' স্বীকার করে নিলাম।"

হিরণ্ময়ী একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে দুঃখের মধ্য দিয়া আরও ছ'টী মাস অতিবাহিত হইল।

সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছিলেন, তাঁহার বধূমাতা ক্রোড়ে একটি পুত্ররত্ন পাইয়াছেন। প্রায় দেড় বৎসর হইল তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিয়া যেদিন তিনি গৃহটি প্রথম শূন্য দেখিয়াছিলেন, সেদিন তিনি যেমন দৃঢ় ছিলেন, আজ এ আনন্দের সংবাদেও ততখানি দৃঢ় রহিলেন। ইদানিং ঘোষ-গৃহিণীই আসিয়া আবার তাঁহাকে শুনাইতেছিলেন যে, "আর কেন, এখনত বেশ শুধ্‌রে গেছে আমার বদ্দিনাথই ত এসে বলে,—ব্রজেন নাকি যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম আর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা দুইই পেয়েছে। আহা! কচি মেয়েটি—কোলে একটী কাঁচা ছেলে—এখন তাদের ঘরে আন।"

কিন্তু এ সকল কথা যে সিদ্ধেশ্বরীর কাণে ঢুকিতেছে পাড়ার লোকে এমন কোন লক্ষণ বুঝিত না। তিনি পুত্রের সম্বন্ধে যত প্রকারের আলোচনা সমস্তই শুনিয়া যাইতেন—তাঁহার অন্তরের কথা কেহ জানিতে পারিত না।

হিরণ্ময়ীরা খুবই কষ্টে পড়িল। কিন্তু ব্রজেন যে আর গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যায় না—কোন দলে মিশে না এই আনন্দে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাহার স্বাস্থ্য অল্পে অল্পে ফিরিতে লাগিল। তাহার মনে সাধ বাসনাও পুনর্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে শিশুটির জন্য একটি ভেলভেটের

জামা খরিদ করাইয়া আনিল। শিশুটি ছয় মাসের। হিরণ্ময়ী খাওয়া দাওয়ার পরে একটি ঘরে সেই জামাটি লইয়া ব্যস্ত ছিল। ব্রজেন হঠাৎ প্রবেশ করিয়া দেখিল, হিরণ্ময়ী ভেলভেটের জামাটির উপরে জরি দিয়া সূচের সাহায্যে অক্ষর তুলিতেছে। ব্রজেনকে দেখিয়া কাপড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি জামাটি সে লুকাইয়া ফেলিল। বলিল,

"এখন না। আমার লক্ষ্মীটি, এখন এখান থেকে যাও—পরে দেখ্‌বে।"

পরদিন হিরণ্ময়ী স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "বাড়ীতে একবার যেতে হবে যে; শুনতে পেলে? পাল্‌কীর দরকার নেই—গরুর গাড়ী একখানা ভাড়া করে আন।"

ব্রজেন বিস্মিত দৃষ্টিতে হিরণের মুখের দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের রাগ পড়েছে নাকি?"

হিরণ্ময়ী হাসিয়া কহিল, "চিরকাল বুঝি ছেলের উপর রাগ করে থাকা যায়। চলনা দেখে আস্‌বে।"

ব্রজেন মনে করিল, হয়ত তাহার মাতা হিরণ্ময়ীর নিকটে খবর পাঠাইয়া থাকিবেন।

সে গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিলে শিশুপুত্রকে অঞ্চলে ঢাকিয়া হিরণ্ময়ী সাবধানে যাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ব্রজেন পিছনের খোলা জায়গাটায় গিয়া উপবেশন করিল।

সিদ্ধেশ্বরী আনমনে একলাটী চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী ধীরপদে সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং অঞ্চল অপসৃত করিয়া শিশু-টিকে ক্রোড় হইতে শ্বশ্রূর পায়ের তলে মাটির উপর শোয়াইয়া দিল। ভেলভেটের জামাটির উপর জরির অক্ষরে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল,—

'মাতৃ-ঋণ'

সিদ্ধেশ্বরী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রবধূ স্বামীকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া লইয়া কুসুমস্তবকের মত এক অপূর্ব্ব নূতন সম্পদের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু দুটী স্নেহে বিগলিত হইয়া ভূমিশয্যার সেই দুর্লভ রত্নটির উপর যাইয়া নত হইল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সাগ্রহে শিশুটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চুমায় চুমায় মুখখানা তাহার রাঙা করিয়া তুলিলেন। বলিলেন,

"ঋণ পরিশোধ করতে এলে মা! যে ঋণী—সে কই?"

হিরণ্ময়ী ঘরের বাহিরের দ্বারের আড়ালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

সমাপ্ত

চৌচির

আবুল ফজল

বুলবুল পাবলিশিং হাউস
২৩ ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট
কলিকাতা